তুর্কী ভারত

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
তত্ত্বচিন্তামণি সিদ্ধান্তবারিধি
প্রণীত

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র
বি,এ সম্পাদিত।

শিশির পাবলিশিং হাউস
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি,এ
শিশির পাবলিশিং হাউস
৫৯ নং বিডন ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীশ্রীলাল জৈন কাব্যতীর্থ
জৈনসিদ্ধান্তপ্রকাশক প্রেস
৯, বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা।

তুর্কী-বীর-শ্রেষ্ঠ

তুরস্কের গৌরব-সূর্য্য

মহামতি গাজী মুস্তাফা কামাল পাশার

বীর-নামে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

উৎসৃষ্ট হইল।

সূচনা

তুর্কীর সহিত ভারতের বহুকালের সম্বন্ধ। তুর্কীরা ভারতে আসিয়া ভারতবাসীর উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইয়া গিয়াছে, এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু এমন এক দিন গিয়াছে,—প্রায় তিন চারি হাজার বর্ষের পূর্ব্বের কথা—ভারতের প্রত্যন্তপ্রদেশ হইতে বীর্য্যবান্ আর্য্যক্ষত্রিয়গণ তুর্কীর দেশে—এসিয়ামাইনরে গিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে বৈদিকধর্ম্মের প্রভাবের কথাই জানাইয়া দেয়। সেই সুদূর অতীতকালে তাঁহারা যে খোদাই করা অনুশাসনলিপি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মিত্র, বরুণ, নাসত্য (অর্থাৎ অশ্বিযুগল) প্রভৃতির বৈদিক দেবপূজার সন্ধান পাওয়া যায়। সেই সুপ্রাচীন কালে বেদমার্গাবলম্বী আর্য্য ভিন্ন অপর কেহই ঐ সকল দেবতার পূজা করিত না। সেই বেদমার্গী ক্ষত্রিয়গণ মিত্তানী নামে পরিচিত ছিলেন। তৎকালে এই তুর্কীর দেশে আর এক পরাক্রান্ত শাসক জাতি রাজত্ব করিতেন—তাঁহাদের নাম ছিল হিতাইত বা

খেতখত্তি। উভয়েই ক্ষত্রিয় জাতীয় হইলেও, দুই দলের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি ধর্ম্মমত সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। এসিয়ামাইনরের আধিপত্য লইয়া সেই দুই প্রবল জাতির মধ্যে দারুণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। অবশেষে উভয়পক্ষ সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হন। এসিয়া-মাইনরের অন্তর্গত বোঘজ্‌কোই নামক স্থান হইতে খৃষ্ট-পূর্ব্ব চৌদ্দশত শতকের পূর্ব্বতন কয়েকখানি কীলরূপা শিল্পলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে হিতাইত-পতি সুব্বী-লুলিউম ও মিত্তনী-পতি মত্তিবজ এই দুই রাজার সন্ধিপত্র আছে। এখন যেখানে মেসোপোটেমিয়া প্রদেশ তাহারই উত্তরাংশে মিত্তনীরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। মিত্তনী-গণই বৈদিক দেবোপাসক ছিলেন। যে মত্তিবজ নৃপতির নাম বলিয়াছি তাঁহার প্রপিতামহের নাম ছিল সৌসত্র—পিতামহের নাম অর্ততম এবং পিতার নাম সুতর্ণ। এই সকল নামগুলি বৈদিকনামের সহিত যেন একছাঁচে ঢালা। কতদিন হইল সেই বেদমার্গী ক্ষত্রিয়গণ তুর্কীর দেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এখনও তাহার সঠিক খবর পাওয়া যায় নাই। তবে এটা ঠিক যে তাহারও বহু পূর্ব্বে এখানে বৈদিক আর্য্যসমাগম হইয়া-ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা সকলেই শুনিয়াছ। বৈদিক

আর্য্যগণের নিকট অশ্বমেধ একটি প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান। অশ্বমেধের ঘোড়া চড়িবার জন্য নহে—তাহার মেধে যজ্ঞ হইত। যজ্ঞান্তে তাহার মাংস সকলে অতি পরিতোষে আহার করিত। বাবিলনের সুপ্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায়, ১৯৫০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে সেখানে প্রথম অশ্ব আনীত হইয়াছিল। সেই অশ্ব ব্যবহারের জন্য নহে—যজ্ঞের জন্য আনা হইয়াছিল। কাশ নামক আর্য্যক্ষত্রিয়গণ যজ্ঞ করিবার জন্যই এখানে অশ্ব আমদানী করিয়াছিলেন। ইতিহাসে তাহারাই ক্যাসাইট (Kassites) এবং আমাদের প্রাচীন মহাপুরাণ সমূহে কাশেয় বা কাশ্য নামে পরিচিত। তোমরা শুনিয়া আনন্দিত হইবে যে এই জাতি হইতেই ভারতে কাশী জনপদ ও কাশীরাজ-বংশের নামকরণ হইয়াছে। এই কাশ জাতির প্রধান উপাস্য-দেবতা ছিলেন সূর্য্য। সেই সূর্য্য হইতেই তাঁহাদের অধিকৃত জনপদ "সূরীয়" অধুনা 'সিরীয়া' নামে পরিচিত। এই কাশ জাতির সহিত মিত্তনী ক্ষত্রিয়গণের কি সম্বন্ধ ছিল তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই। তবে উভয় জাতিই যে পূর্ব্বদিক্ হইতে গিয়া তুর্কীর দেশ দখল করিয়া লইয়াছিল, তাহা এখন পুরাবিদ্গণ স্বীকার করিতেছেন।

সূচনা

ভারতীয় আর্য্যক্ষত্রিয়গণের প্রভাব বিস্তারের সহিত ভারতীয় বণিক্‌গণও তাহাদের স্বভাবসুলভ বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া এই তুর্কীর দেশে যাতায়াত করিত। খৃষ্টানদিগের আদি ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল হইতে জানা যায় যে ১৭০৬ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে যুসফ যখন মিশর দেশে যাত্রা করেন, তৎকালেও তিনি দেখিয়াছিলেন নানা সম্প্রদায়ের বণিক্‌গণ ভারতজাত ও ভারতীয় অনুদ্বীপ-জাত তেজস্কর ভক্ষ্যদ্রব্য ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য লইয়া যাইতেছে। চারি হাজার বর্ষেরও পূর্ব্ব হইতে ভারতীয় বণিক্‌গণ আরবসাগর দিয়া সুদূর এসিয়ামাইনরে বাণিজ্য করিতে যাইত, পুরাবিদ্‌গণ তাহাও অনেকদিন স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মিশর ও বাবিলনের সহিত ভারত-বাসী বণিক্‌গণের নানাপ্রকার বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল—এই সম্বন্ধ সাতশত খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ হইতে তিনশত খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই, তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন বাহির হইয়াছে। কিন্তু হায়! সেই অতীত ইতিহাস এখন সকলেই ভুলিয়া গিয়াছেন। ভারতীয়ের প্রভাব কিরূপে বিলুপ্ত হইল, তাহারও যোগসূত্র হারাইয়া গিয়াছে। তবে বলা যায় না যেরূপ বোঘজ্‌কোই হইতে আবিষ্কৃত সুপ্রাচীন শিলালিপি হইতে আমরা এসিয়ামাইনরে দূর

অতীত কালের বৈদিক ধর্ম্মের নিদর্শন পাইতেছি, সেই-রূপ আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে প্রাত্নতত্ত্বিক-গণের গবেষণার ফলে, তুর্কীর দেশে ভারতীয়ের প্রভাবের অতীত-কাহিনী প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

যে সময়ের কথা বলা হইল, তখনও খৃষ্টান বা ইসলামধর্ম্মের জন্ম হয় নাই। তুর্কীর দেশের লোকেরা তখনও ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। তাহাদের শুভাদৃষ্ট গুণে পয়গম্বর মহম্মদ আবির্ভূত হইলেন। সেই ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মার বিস্তৃত পরিচয় এই ক্ষুদ্র সূচনায় দেওয়া অসম্ভব। তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যে অল্পদিন মধ্যেই কেবল আরব নহে, সমস্ত তুর্কীর দেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে তরবার লইয়া পারস্য হইতে সুদূর স্পেনদেশ পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রভাবে প্রাচ্যরোমক সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত এবং মহাশক্তিশালী পারস্যও বিদলিত হইয়াছিল। প্রাচ্যরোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী রুম বা কনস্তন্তনিয়ায় তাহাদের ধর্ম্মজগতের নেতা খলিফার রাজ-ধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুসলমান ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্ব্বে খলিফার সভায় ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ও চিকিৎসকগণের

যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তথায় তিনখানি প্রধান চিকিৎসা-গ্রন্থ যথা সরক, সরসদ ও য়েদান তিনখানি আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য সেই তিনখানি আমাদের ভারতের প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থ চরক, সুশ্রুত ও নিদান।

ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য, ভারতের বিদ্যা ও ভারতের সৌন্দর্য্যের কথা তুর্কীরাজ-সভায় সর্ব্বদাই জল্পনা কল্পনা হইত। তুর্কীরা তৎকালে বহু সাম্রাজ্য দখল করিয়া মহাশক্তিশালী হইয়া পড়িয়াছিল। কিরূপে তাহারা ভারত বিজয় করিবে সেদিকে সকলেই যেন আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কিরূপে তুর্কীরা ধীরে ধীরে ভারতে প্রবেশ করিয়া সোণার ভারত দখল করিয়া বসিল তাহা-রই সার কথাগুলি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

এই পুস্তকখানি কিরূপে আমার স্কন্ধে পড়িল তাহার একটু পরিচয় দেওয়া উচিত। একদিন সৌম্যদর্শন শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র মহাশয় আমার সহিত দেখা করিতে আসেন এবং তাঁহার "পৃথিবীর ইতিহাসের" পুস্তিকার মধ্যে "তুর্কী ভারত" সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি পাঁচ

বৎসরের উপর হৃদ্‌রোগ ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় এক প্রকার শয্যাগত আছি। এই রুগ্ন ভগ্ন শরীরে সহসা কোন পুস্তক রচনা করিতে যাওয়া আমার পক্ষে শোভনীয় নহে। কিন্তু বলিতে পারিনা কেন যে প্রিয়দর্শন শিশির বাবুর আহ্বান মুখ ফুটিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। হঠাৎ স্বীকার করিলাম। কিন্তু কিরূপে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে তদ্বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তার কারণ ছিল। এই সময়ে আমার অশেষ স্নেহভাজন শ্রীমান্ বিমানবিহারী মজুমদার এম, এ, ভাগবতরত্ন আমাকে উপযুক্ত ভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। বলিতে কি শ্রীমানের অসাধারণ অধ্যবসায়গুণে এবং তাহার প্রধানতঃ পরিশ্রমের ফলে এই পুস্তকখানি বর্ত্তমান আকারে প্রকাশিত হইল।

বিশ্বকোষ কুটীর
৮, বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার,
১৭ আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৩১

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

মুখবন্ধ

মুসলমানদের মধ্যে প্রথমে আরবেরা আমাদের দেশ জয় করিতে আসেন। কিন্তু তাঁহাদের অধিকার এখানে স্থায়ী হয় নাই। তাহার পর যে সকল রাজবংশ ভারতবর্ষ আক্রমণ ও অধিকার করেন তাঁহারা সকলেই তুর্কী। তাঁহাদের যে সকল অনুচর সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যেও অনেকে তুর্কী।

ঐতিহাসিকেরা সকলেই জানেন যে লোদী ও সুরবংশ ব্যতীত ভারতে পাঠান-রাজবংশ বলিয়া পরিচিত সকল বংশই তুর্কী। সুরবংশের ইতিহাস মোগল ভারতের অন্তর্গত। তাই আমরা "পাঠান ভারত" এই ভ্রমাত্মক নাম আর ইতিহাসে না চালাইয়া "তুর্কী ভারত" নাম দিলাম।

দাহির পত্নী স্বয়ং পরিচালনা করিয়া সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছিলেন।

পৃঃ ৪—তুর্কীভারত।

তুর্কী ভারত

প্রথম অধ্যায়

সিন্ধুতীরে আরব

সতেরো জন অশ্বারোহী সৈন্য বাঙ্গলাদেশ জয় করিয়াছিল এ কথাটা মিথ্যা। কিন্তু একজন সতেরো বছরের ছেলে যে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম রীতিমত ভাবে ভারত আক্রমণ করে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। এই নবীন যুবকের সাহস ও অধ্যবসায় অসাধারণ। যে দেশের অনন্ত জ্ঞান, অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য ও অদ্ভুত বীরত্বের কথা মুসলমানেরা এতদিন ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছিলেন, সেই দেশ জয় করিয়া লইবার বাসনা লইয়া মহম্মদ বিন্ কাশিম বাহির হইলেন। ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আর কোন মুসলমান এমন দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা লইয়া আসে নাই।

মহম্মদ বিন্ কাশিমের সহিত ছয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য আর নয় হাজার উষ্ট্র আসিল। তিনি মরুভূমির সন্তান কিনা তাই অত উষ্ট্র তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে হইয়াছিল। পথে আসিতে আসিতে যে শুনিল এই অল্পবয়স্ক তরুণটী নূতন এক মহাদেশ জয় করিতে যাইতেছে, সেই বিস্মিত হইয়া গেল। দলে দলে লোক মহম্মদ বিন্ কাশিমের সহিত যোগ দিল।

তরুণ যুবকের মনে ধর্ম্মের ভাব অত্যন্ত প্রবল ; কিন্তু সে ধর্ম্মভাবের মধ্যে সহিষ্ণুতা ছিল না। মুসলমান ধর্ম্ম ব্যতীত আর সকল ধর্ম্মই মিথ্যা অতএব সেই বিধর্ম্মীদের মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য এইরূপ তিনি মনে করিলেন। তাই তাঁহার প্রথম কোপ-দৃষ্টি পড়িল একটি মন্দিরের উপর। সিন্ধুপ্রদেশের তৎকালীন প্রধান বন্দর দেবলে এই মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

হিন্দুগণ তাহাদের ধর্ম্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু মুসলমানদের তখন নবজাগ্রত শক্তি—বহু অস্ত্র-শস্ত্র তাহারা নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছে। সেইজন্য তাহাদের আক্রমণ হইতে মন্দিরটীকে রক্ষা করা গেল না। ভারতের দুর্দ্দিনের সূচনা সেই দিনই হইল।

ইহার পর মহম্মদ বিন্ কাশিম্ দেশের মধ্যে রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রবেশ করিলেন। রাজা দাহির এমনভাবে সৈন্য সাজাইয়াছিলেন যে মহম্মদের পক্ষে জাহাজ হইতে তীরে অবতরণ করাই কঠিন হইল। কিন্তু অবশেষে বহুচেষ্টার পর মুসলমানেরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইল। হিন্দুরা সামান্য পরাজয়ে বিন্দুমাত্র দমিলেন না। দাহির তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত একেবারে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। হিন্দুর সেদিন জীবন-মরণের সমস্যা। প্রত্যেক হিন্দুবীর ধমনীর শেষ রক্তবিন্দু দিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন। বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাদের গলেই জয়মাল্য পরাইয়া দিবেন এমন সময়ে সহসা একটী জ্বলন্তগোলা আসিয়া দাহিরের হস্তীর পদতলে পড়িল। হাতী ইহা দেখিয়া বড়ই ভীত হইল। সে প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে নিকটবর্ত্তী নদীর মধ্যে অবগাহন করিতে ছুটিল। এদিকে দাহিরের সৈন্যদল ভাবিল রাজা বুঝি পরাজিত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতেছেন। রাজা এই ভাব বুঝিতে পারিলেন। তখন একটী তীর আসিয়া তাঁহার দেহে বিদ্ধ হইয়াছে। তিনি ব্যথায় মুহ্যমান। কিন্তু তথাপি দেশ রক্ষা করি-

তেই হইবে। দাহির একটী অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় আগমন করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তিনি আর কিছুই করিতে পারিলেন না। মুসলমানেরাই সেদিন বিজয়ী হইল।

ভীরু রাজপুত্র পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু দাহিরের পত্নী ছিলেন অপূর্ব্ব তেজস্বিনী মহিলা। দেশের যখন ঘোরতম দুর্দ্দিন, সেই সময় তাঁহার লজ্জা করিলে চলিবে না একথা তিনি ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধ করিতে অনভ্যস্ত ছিলেন না। সে যুগের হিন্দু-মহিলারা বিশেষতঃ উচ্চবংশসম্ভূতা রমণীগণ রীতিমত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। তাই দাহির-পত্নী অবশিষ্ট সৈন্যদলকে একত্র করিয়া নগরের সকল তোরণ বন্ধ করিয়া দিলেন। মুসলমানেরা নগর অবরোধ করিল। তাহারা নগরের বাহির হইতেই অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছিল। দাহির-পত্নী স্বয়ং পরিচালনা করিয়া সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু বিজয়োন্মত্ত মুসলমানদের সহিত মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া তিনি কতক্ষণ যুঝিবেন ? দাহির-পত্নী হতাশ হইয়া নিজে তাঁহার সঙ্গিনীদের সহিত জ্বলন্ত অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন

করিলেন। রাজপুত-মহিলা চিরদিনই জীবন অপেক্ষা সম্মানের মূল্য অধিক বলিয়া জ্ঞান করে। পুরুষ হিন্দু সৈন্যেরা "মার মার" শব্দ করিয়া মুসলমানদিগকে মরিয়া হইয়া আক্রমণ করিল। মুসলমানেরা তাহাদের তেজ দেখিয়া বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইল না।

তাহার পর সিন্ধুপ্রদেশে নগরের পর নগর মুসলমানদের অধিকারে আসিতে লাগিল। যে সকল হিন্দু নৃপতি প্রজাদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাদের অধীনস্থ জনপদের লোকেরা মুসলমানদের সহিত যোগ দিল। ফলে সিন্ধুপ্রদেশ জয় করা মহম্মদ বিন্ কাশিমের পক্ষে সহজ হইয়া উঠিল।

যে সকল জাতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল, তাহাদের প্রতি তিনি [illegible]য় ব্যবহার দেখাইলেন। ধর্ম্ম অপেক্ষাও অর্থ জিনিষ[illegible]কে আরবেরা বড় মনে করিলেন। তাই হিন্দুধর্ম্মের উপাসকগণের নিকট হইতে একটা কর লইয়া তাহাদিগকে ইচ্ছামত ধর্ম্ম আলোচনার স্বাধীনতা দিলেন। কিন্তু ত[illegible] বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের উপর অত্যাচার যে একেবারে হইল না তাহা নহে। একগাড়ী চতুর্ভুজ

বিষ্ণুমূর্ত্তি খলিফার নিকট উপহার পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু মোটের উপর আরবেরা ধর্ম্মান্ধ হইয়া আমাদের ধর্ম্মের উপর বেশী অত্যাচার করেন নাই। তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিতেন ও তাঁহাদিগকেই উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিতেন।

মহম্মদ বিন্ কাশিম বিজয়ী হইয়া দেশে ফিরিলেন। মনে তাঁহার কত আশা। কত মধুর কল্পনা লইয়া তিনি খলিফার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। কিন্তু তখন এক নূতন খলিফা হইয়াছেন। তিনি মহম্মদ বিন্ কাশিমের গুণের পরিচয় বিশেষ জানেন না।

মহম্মদ বিন্ কাশিম খলিফাকে উপহার দিবার জন্য দাহিরের দুই অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যাকে ধরিয়া আনিয়াছিলেন। কুমারীদ্বয়কে তিনি যথারীতি খলিফার পদে উপহার দিলেন। খলিফা মেয়ে দুইটীর রূপ দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন। কিন্তু তাহাদের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিতেছিল। তাহারা মহম্মদ বিন্ কাশিমের নামে মিথ্যা করিয়া খলিফার নিকট অভিযোগ আনিল। সেই কথা শুনিয়া খলিফা তো চটিয়া আগুন। দেবভোগ্য জিনিষে প্রথমেই দানবের দৃষ্টি!

খলিফা ক্রুদ্ধ হইয়া মহম্মদ বিন্ কাশিমকে কাঁচা গরুর চাঁমড়ায় সেলাই করিয়া হত্যা করিলেন। এইরূপে মহাবীর মহম্মদ বিন্ কাশিম জীবনের সকল সাধ অপূর্ণ রাখিয়াই ইহলোক ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

সিন্ধুপ্রদেশ আকারে ইংলণ্ডের সমতুল্য। ইহা আরবদিগের অধিকারে আসিল বটে, কিন্তু তাঁহারা আর অধিকার বিস্তার করিবার কোন চেষ্টা করিলেন না। মুলতানে তাঁহাদের জাতীয় লোকেরা প্রায় আড়াইশত বৎসর রাজত্ব করিলেন। তাঁহারা হিন্দুগণের যুদ্ধবিগ্রহেও সময় সময় যোগ দিতেন। কিন্তু আরব অধিকারের ফলে ভারতে স্থায়ী মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হয় নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তুর্কীর দস্যুতা

ভারতবর্ষে আরবের আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া গেল। আরবজাতি এক হাতে কোরাণ, আর এক হাতে তরবারী লইয়া বাহির হইয়াছিল। মহম্মদের প্রচারিত নবীন ধর্ম্ম সমস্ত জগৎকে গ্রহণ করাইবার জন্য আরব সকল দেশ জয় করিয়া লইবে স্থির করিয়াছিল। বহুদেশ তাহারা জয় করিল, ইউরোপ তাহাদের বিক্রম দেখিয়া যার পর নাই ভীত হইল, কিন্তু ভারতবর্ষ তাহাদের করতলগত হইল না।

তখনও ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রাণ ছিল। তাঁহারা তখনও স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতেন—কেমন করিয়া বক্ষের রক্ত দিয়া তাহা রক্ষা করিতে হয়, তাহা জানিতেন। পরস্পরের মধ্যে কলহ করিয়া বিদেশীকে আহ্বান করিতে তখনও তাঁহারা অভ্যস্ত হয়েন নাই। তাই আরবের আক্রমণ অপর দেশে সফল হইলেও,

ভারতে বিফল হইয়া গেল। অবশ্য তাহার আরও অন্য কারণ ছিল। আরবগণ যে দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়াছিল, সেদিকে তাহাদের নানা অসুবিধা ছিল। আর প্রথমেই তাহারা যে প্রদেশ অধিকার করিল, তাহা সমস্ত ভারতের মধ্যে অনুর্ব্বর বলিয়া খ্যাত। তাই এদেশে আরবের সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল না।

কিন্তু মুসলমান-জগতে ভারতের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের কথা ছড়াইয়া পড়িল। মরুভূমির লোক—যাহারা ধন-রত্নের মুখ কোন দিন দেখে নাই—তাহারা ভারতের শস্যশ্যামল দেশ, অভ্রভেদী সৌধমালা ও মণিমাণিক্যের চাকচিক্য দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিল। তাহারা এই দেশের সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী প্রচার করিল, তাহাতে দস্যুর লোলুপদৃষ্টি এদেশের উপর পড়িতে বিলম্ব হইল না।

আরবগণের সিন্ধুদেশ জয়ের পর আড়াইশত বৎসর ধরিয়া আর কোন বৈদেশিক ভারতবর্ষে পদার্পণ করিতে সাহসী হয় নাই। তখনও প্রতীচ্য ভারতের শৌর্য্যবীর্য্যে সকলে ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল। বিজয়লাভের আকাঙ্ক্ষা—ধনরত্ন লুণ্ঠনের প্রলোভন লোককে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ও দুঃসাহসিক কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া ফেলে। তাই আড়াই-

শত বৎসর পরে আবার একদল অসম সাহসিক মুসলমান ভারতের দিকে অগ্রসর হইল।

তাহারা জাতিতে তুর্কী। বোগদাদের আব্বাসবংশীয় খলিফাগণ পারসিক কর্ম্মচারিগণের ষড়যন্ত্র হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য ইহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। দলে দলে সুন্দর তরুণ তুর্কী যুবকগণ খলিফার সৈন্যদলে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে তাহারাই মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রকৃত কর্ত্তা হইয়া পড়িল। কারণ খলিফাগণ তখন বিলাসস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। মিশর হইতে আরম্ভ করিয়া সমরকন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের মধ্যে তুর্কীরাই প্রাধান্য লাভ করিল। পারস্যদেশে বাস করিতে যাইয়া সেখানেও তাহারা আধিপত্য বিস্তার করিল। পারস্যের সামানীয় রাজ্যও প্রকৃতপক্ষে তাহা-দের পরিচালনাধীনে চলিতে লাগিল। এই সময় হিমালয়ের উত্তর প্রদেশে তুর্কী অধিকার বিস্তৃত হওয়ায় আমাদের কোন কোন পুরাণে 'তুরুষ্ক' ভারতের উত্তর-সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উত্তর পারস্যের সৈন্যদলের নেতাদের মধ্যে একজন বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার নাম আলপ্তগীন্। তিনি তাঁহার সামানী-বংশীয় প্রভুর সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহার

কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মনে ছিল অসীম তেজ। তাই তিনি মাত্র দুই সহস্র অনুচরের সহিত নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে বাহির হইলেন। বিজয়লক্ষ্মী পুরুষসিংহের গলে বরমাল্য পরাইয়া দিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আলপ্তগীন্ আফগানের পর্ব্বতমালার মধ্যে গজনী নামে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন। এখানে তাঁহার কার্য্যে বাধা দিবার কেহই ছিল না।

তাই আলপ্তগীন্ নীরবে নিজের ক্ষুদ্র রাজ্যটার উন্নতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কার্য্যে একজন বড় বিশ্বস্ত অনুচরকে সহকারিরূপে পাইয়াছিলেন। ইহার নাম সবক্তগীন। সবক্তগীন যখন নিতান্ত শিশু তখন একজন বণিক্ তাঁহাকে ক্রয় করিয়া লয়েন। সে সময়ে মানুষক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তবে য়ুরোপে যেরূপ দাসগণকে মানুষরূপেই গণ্য করা হইত না, ইহাদের ম[illegible] সেরূপ ছিল না। দাসদিগের বুদ্ধি ও প্রতিভা থাকলে, তাহারা উচ্চতম রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইত, এমন কি নিজ সম্রাট্প্রভুর কন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়া সম্রাট্ পর্য্যন্ত হইতে পারিত। দাস বলিয়া কেহ কাহাকেও ঘৃণা করিত না। এরূপ উদারতা যথার্থই প্রশংসনীয়।

গ্রীক্, শক, হূণ প্রভৃতি যত জাতি ভারতবর্ষে রাজ্য-স্থাপন করিতে আসিয়াছে, সকলেই ঐ পথটী দিয়া আসিয়াছে। তাই যখন তুর্কীরা উত্তর-পশ্চিম দিকের পথের সন্ধান পাইল, তখনই তাহাদের ভারত-জয়ের আশা সফল হইতে চলিল। আরবেরা এ পথের সন্ধান পায় নাই। প্রথমে তুর্কীরা ঐ পথ বাহিয়া ভারতবর্ষে লুণ্ঠন করিতে আসিত।

তাহার পর বারংবার এ দেশের ধনরত্ন অপহরণ করিয়া লইয়া যাইয়াও যখন উহারা দেখিল যে এ দেশের ঐশ্বর্য্য ফুরাইবার নহে, তখনই তাহারা চিরস্থায়ী জয় করিবার সংকল্প করিল। সবক্তগীন বা মাম্মূদ কেবলমাত্র দস্যুরূপে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন—রাজ্য-স্থাপন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

সবক্তগীন যখন এদেশে আক্রমণ করিতে আসিলেন, তখন জয়পাল পঞ্জাবের রাজা। জয়পাল জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। মুসলমানেরা তাঁহার রাজ্য বার বার আক্রমণ করিতে লাগিল। তিনি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে স্থির করিলেন যে ঘরে বসিয়া বারংবার এরূপ অত্যাচার সহ্য করা কর্ত্তব্য নহে। অত্যাচারী প্রবল তাহা তিনি জানিতেন। তথাপি

দেশরক্ষার ভার যখন তাঁহার উপরে ন্যস্ত, তখন প্রাণপণ করিয়াও তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবেন। জয়পাল হস্তিদল সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে ঐ বিরাট্‌কায় জন্তুগুলিকে দেখিয়াই মুসলমানেরা ভয়ে পলায়ন করিবে। অনেক সৈন্যও তিনি নিজের সঙ্গে লইলেন। তাহার পর গজনীতেই সবক্তগীনকে যুদ্ধ দিবার জন্য অভিযান করিলেন। এদিকে সবক্তগীন এই সংবাদ পাইয়া ভাবিলেন বিধর্ম্মী হিন্দু আসিয়া তাঁহার সাধের গজনী আক্রমণ করিবে, ইহা তিনি জীবন থাকিতে কখনও ঘটিতে দিবেন না। তাই তিনিও সসৈন্যে রাজধানী হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে চলিল তাঁহার বালক-পুত্র মাহ্মূদ। মাহ্মূদ বালক হইলেও সেই বয়সেই সে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছে। লম্‌ঘানের নিকট উভয় দলের সাক্ষাৎ হইল। সামান্য যুদ্ধ যাহা হইল তাহাতে মাহ্মূদ তাহার বীরত্বের পরিচয় দিলেন। সবক্তগীন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার উপযুক্ত বংশধর, তাঁহার জীবনের ব্রত পালন করিতে পারিবে। কয়েকদিন পরে ভীষণ ঝড়ে জয়পালের অনেক সৈন্যাদি নষ্ট হইয়া গেল। তিনি আর তখন যুদ্ধ করিতে ভরসা পাইলেন না। তখন দূত পাঠাইয়া

সবক্তগীনের সহিত সন্ধি করিলেন। পঞ্চাশটী হস্তী ও কিছু অর্থ সবক্তগীনকে সেই স্থলেই প্রদান করিলেন। কিন্তু সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে সমস্ত অর্থ তিনি তখন তাঁহাকে দিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "কয়েক জন লোক আমার সহিত পাঠাইয়া দিউন, আমি রাজধানীতে যাইয়া প্রতিশ্রুত সমস্ত অর্থ ইহাদিগকে দিয়া দিব।" সবক্তগীন্ স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু লাহোরে ফিরিয়া আসিয়া রাজা গজনীর দূতদিগকে হত্যা করিলেন ও অর্থপ্রদানে অস্বীকৃত হইলেন।

সবক্তগীন্ এই সংবাদ পাইয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি সৈন্য-সামন্ত লইয়া আবার যুদ্ধ করিতে বাহির হইলেন। জয়পাল তখন বিপন্ন হইয়া ভারতের অন্যান্য রাজাদিগের সাহায্য চাহিলেন। তখনও ভারতে একতা ছিল। দিল্লী, আজমীঢ়, কনোজ প্রভৃতি স্থানের রাজন্যবৃন্দ তাঁহাদের সৈন্যদল জয়পালের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। ঐ সকল রাজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে লাহোরে জয়পাল পরাজিত হইলে, মুসলমানগণ তাঁহাদের রাজ্যও আক্রমণ করিবে। তাই জয়পালের বিপদকে তাঁহারা নিজের বিপদ মনে করিয়া সাহায্য করিলেন। আবার যুদ্ধ হইল। কিন্তু নব-

জাগ্রত মুসলমান-শক্তির নিকট হিন্দুগণ পরাভূত হইলেন। লাহোরের রাজা কর প্রদানে স্বীকৃত হইলেন। পঞ্জাব প্রদেশ সবক্তগীনের অধীনতা স্বীকার করিল বটে, কিন্তু তাঁহার অধিকার স্থায়ী হইল না। তবে তুর্কীরা বুঝিতে পারিল যে চেষ্টা করিলে তাহারা একদিন সমগ্র ভারতবর্ষ হয়তো জয় করিয়া লইতে পারিবে।

সবক্তগীন্ ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার পুত্র মামুদ পিতার অধীনে উপযুক্তরূপ শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অসাধারণ শৌর্য্যবলে এরূপ কার্য্য করিলেন, যে সবক্তগীন্ তাহা কোন দিন স্বপ্নেও মনে আনিতে পারেন নাই।

মামুদের চরিত্রে এমন অনেকগুলি গুণ ছিল, যাহার জন্য তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরগণের মধ্যে আজও আসন পাইতেছেন। তিনি যাহার উপর যাহা আদেশ করিতেন, তাহারা তাহাই অবনতমস্তকে পালন করিত। নেপোলিয়নের ঐরূপ সম্মোহিনী শক্তি ছিল। সৈন্যদিগকে যাঁহারা এমন করিয়া বশ করিতে পারেন, যে তাঁহাদের অঙ্গুলীসঙ্কেতে তাহারা জীবন দান করিতেও দ্বিধা বোধ করে না, তাহারাই যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারেন। মামুদ কেবল বাক্য

দ্বারাই সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতেন না। তাঁহার নিজের বীরত্বও ছিল অসাধারণ। তিনি নিজে সকল প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইতেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার অনুচর সৈন্যগণ বীরত্বের সহিত প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইত। মাহ্মূদের অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, আর তাহার নিজের শক্তির উপর নিজের বিশ্বাস ছিল। এরূপ শ্রেণীর লোকের পক্ষে জয়লাভ করা কঠিন নহে। মাহ্মূদের চরিত্রে আর একটী বৈশিষ্ট্য ছিল—তাহার ধর্ম্ম-প্রাণতা। খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে মুসলমান-গণ অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নির্য্যাতন করিতে পারিলেই মনে করিতেন যে তাঁহারা ভগবানের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছেন। তাঁহারা যুদ্ধ করিয়া দেশ জয় করিতেন, আর জোর করিয়া লোককে মুসলমান করিতেন। মাহ্মূদের অন্তরে কিন্তু সত্যই ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস ও ধর্ম্মে প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেন, তখন মনে মনে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া বলিতেন যে ভগবান্ তাঁহার ধার্ম্মিকতার জন্য ঐ পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে যখনই মাহ্মূদ একটু অবসর পাইতেন, তখনই নির্জ্জনে বসিয়া কোরাণ নকল

করিতেন। বোগদাদের খলিফা মাহ্মূদের বীরত্ব দেখিয়া একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই মাহ্মূদকে শান্ত করিবার জন্য বোগদাদ হইতে লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। মাহ্মূদ ভাবিলেন খলিফা তাঁহার ধর্ম্মভাবের পুরস্কার দিলেন। সেই সঙ্গে প্রতিজ্ঞাও করিলেন যে তিনি প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া বিধর্ম্মী হিন্দুদিগকে শাস্তি দানে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

মাহ্মূদ প্রতি বৎসর ভারত আক্রমণ করিতে না পারিলেও, ২৬ বৎসরের মধ্যে ১৭ বার এদেশ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। সিন্ধুতীর হইতে গঙ্গার উপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছিল। প্রথমেই তিনি জয়পালের রাজ্য আক্রমণের সংকল্প করিলেন। জয়পাল তাঁহার পিতার শত্রু। তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া না লইতে পারিলে, আর ভারত-বর্ষের মধ্যে অগ্রসর হওয়া যাইবে না। সেইজন্য মাহ্মূদ তাঁহার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিতে বাহির হইলেন।

জয়পালও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি জানিতেন যে একবার যখন মুসলমানের দৃষ্টি ভারতের সমৃদ্ধির

উপর পড়িয়াছে তখন আর একটা শেষ সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহাদের আক্রমণের নিবৃত্তি হইবে না। তাই "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন" এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া জয়পাল আবার তাঁহার সৈন্যদলকে সাজাইলেন। মাহ্মূদ পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া ভীমবেগে জয়পালকে আক্রমণ করিলেন। জয়পালের সৈন্যসংখ্যা মাহ্মূদের অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহার উপর আবার তিন শত বিরাট্ হস্তী সেই রণবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। কিন্তু মাহ্মূদের রণপ্রতিভার নিকট হিন্দুর পরাজয় হইল। জয়পাল তাঁহার পঞ্চদশ জন জ্ঞাতিসহ বন্দী হইলেন। মাহ্মূদ নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন না। তিনি শত্রুকেও সম্মান করিতে জানিতেন। বন্দী জয়পালকে হত্যা না করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু বন্দীগণের গলায় যে হার ছিল, সে-গুলি ছিঁড়িয়া লইলেন। ঐ হারগুলি সমস্ত মণিমুক্তা দিয়া গ্রথিত ছিল। এক একটী হারের মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। এই সামান্য এক গাছা হারের দাম হইতেই সেকালের ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ বুঝিতে পারা যায়। মাহ্মূদ এই যুদ্ধে জয় করিয়া পঞ্চাশ লক্ষ ভারত-সন্তানকে ক্রীতদাস করিয়া দেশে লইয়া গেলেন। আর
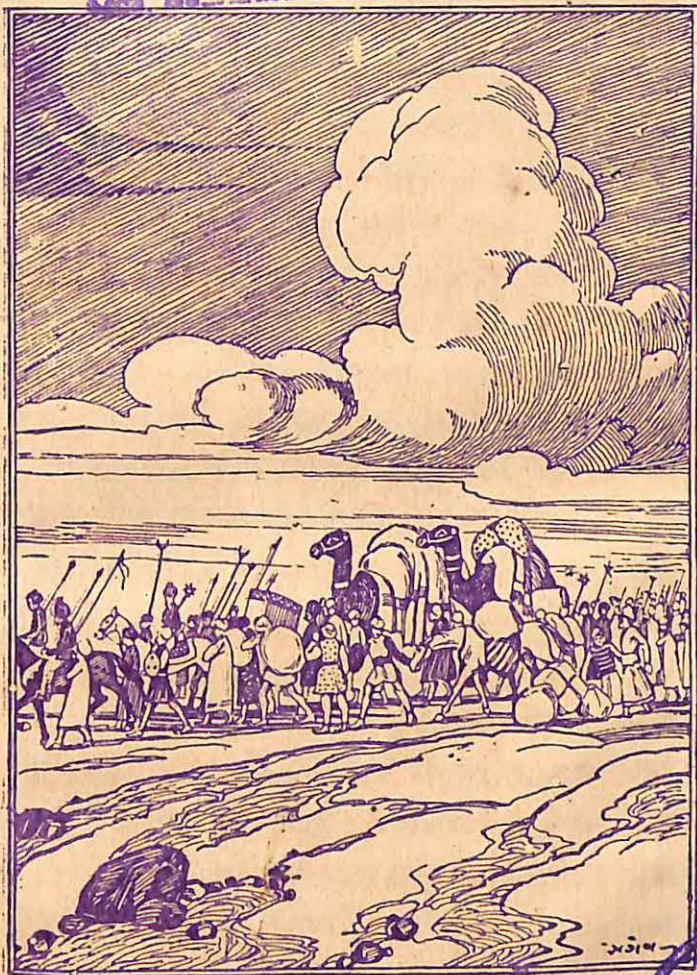
মামুদ এই যুদ্ধে জয় করিয়া পঞ্চাশ লক্ষ ভারত সন্তানকে ক্রীতদাস করিয়া দেশে লইয়া গেলেন। আর ভারতবর্ষের কত ধনরত্ন যে তাঁহার সঙ্গে চলিল, তাহার তো ইয়ত্তাই নাই।
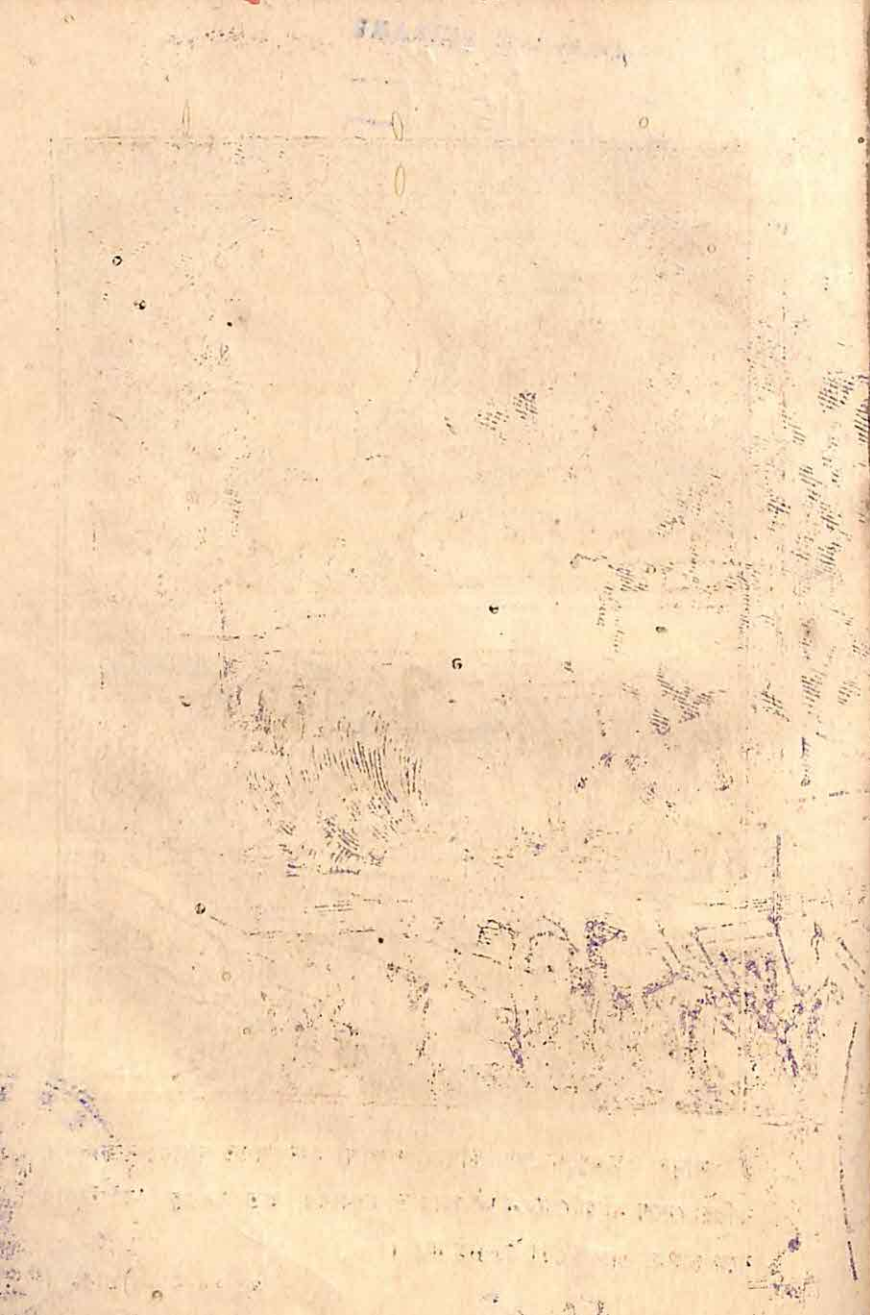
পৃঃ ২০—তুর্কীভারত।

ভারতবর্ষের কত ধনরত্ন যে তাঁহার সঙ্গে চলিল, তাহার তো ইয়ত্তাই নাই। জয়পাল পরাজিত হইয়া যেন মরমে মরিয়া গেলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কখনও বিদেশীর নিকট মস্তক অবনত করে নাই। তিনি এত-কাল ধরিয়া যে প্রজাদের শ্রদ্ধাভক্তি পাইয়া আসিতে-ছিলেন, আজ তাহাদের বিপদের সময়ে রক্ষা করিতে পারিলেন না। আর কোন মুখ লইয়া তিনি আবার রাজ-সিংহাসনে বসিবেন। তখনওতো ভারতবাসী পরা-ধীনতায়—বিদেশীর পদদলনে অভ্যস্ত হয় নাই। তাই জয়পালের মন আত্মগ্লানিতে ভরিয়া উঠিল। তিনি চিতা সাজাইয়া তাহার আগুনে নিজের কলঙ্কিত জীবন বিসর্জ্জন দিলেন।

পিতার এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুর পর পুত্র আনন্দপাল মুসলমানকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবার সংকল্প করিলেন। এদিকে সে সময়ে মাহ্মূদ একবার ভীরা ও একবার মুলতান আক্রমণ করিয়াছেন। ব্যাঘ্র যেমন একবার নররক্তের আস্বাদ পাইলে, বারংবার গ্রামের উপর উৎপাত করিতে আসে, মাহ্মূদও তেমনি একবার ভারতের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়া পুনঃ পুনঃ এই দেশ আক্রমণ করিতে আসিলেন।

আনন্দপাল উত্তর-ভারতের প্রধান প্রধান রাজা-দিগকে আহ্বান করিলেন। সকলেই বিপদের গুরুত্ব তখন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহা-দের সাহায্য লাভ করিতে আর আনন্দপালের বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। ১০০৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দুগণের সমবেতশক্তি মাহ্মূদের গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। মাহ্মূদ এত সৈন্য কখনও দেখেন নাই। এ যেন এক বিশাল জনসমুদ্র। যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই কেবল মস্তক আর বর্শা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না। অত বড় বীরের হৃদয়ও ইহা দেখিয়া একটু কম্পিত হইয়া উঠিল। তারপর হিন্দুগণ তাঁহাদের দেশ ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য ভীষণ শব্দ করিয়া মুসলমান-দিগকে আক্রমণ করিল। সে আক্রমণের তেজ বড় ভীষণ। হিন্দুদের মনে প্রতিহিংসার বৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারা এইবার মুসলমানের উপর পূর্ব্বের সকল অপমান অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। মাহ্মূদ ধীরে ধীরে হটিয়া যাইতেছেন। মুসলমানদের মনে ক্রমে বিষাদ ও নিরাশার সঞ্চার হইতেছে। এমন সময়ে আনন্দপালের হস্তীটী কি কারণে যেন ভয় পাইল। সে আর কিছুতেই অগ্রসর হইল না। আনন্দ-

পাল কত আঘাত করিলেন, কত আদর করিলেন ; কিন্তু হাতী যে কি গোঁ ধরিল—সে ক্রমেই পিছাইয়া যাইতে লাগিল। লোকে ভাবিল রাজা এখন সরিয়া পড়িতেছেন—তখন যুদ্ধে হয়তো হিন্দুদেরই পরাজয় হইয়াছে। এই সন্দেহ যেই মনে হওয়া—অমনি সব নিজের নিজের প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। রাজা কিছুতেই তাহাদিগকে ফিরাইতে পারিলেন না।

অশুভ মুহূর্ত্তে আনন্দপালের হস্তী ভীত হইয়াছিল—অশুভক্ষণে ভারতের সৈন্যদল দেশরক্ষা অপেক্ষা নিজের জীবন-রক্ষাকে বড় মনে করিয়াছিল। আজ সহস্র বৎসর পরেও আমরা—তাঁহাদের বংশধরগণ তাঁহাদের পাপের ফলভোগ করিতেছি। মাহ্মূদ এ যুদ্ধে দৈবের কৃপায় জয়লাভ করিলেন। দুই দিন ধরিয়া তাঁহার উন্মত্ত সৈন্যদল পঞ্জাবের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

তুষারাবৃত পর্ব্বতের উপরে নগরকোট নামে একটী দুর্গ ছিল। সে দুর্গ কেহ ভেদ করিতে পারে না, ইহাই ছিল সকলের বিশ্বাস। তাই হিন্দুরাজগণের মধ্যে অনেকেই সেখানে তাঁহাদের অর্থাদি রাখিয়া দিয়াছিলেন। মাহ্মূদের লোক এ সন্ধানও পাইল। তাহারা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্গবাসী শুনিল

যে ঐ বিজয়ী সৈন্যদল পঞ্জাবের সমবেত ভারতীয় শক্তি-কেও পরাজিত করিয়াছে। তখন আর তাহাদের মনে সাহস রহিল না। দুর্গ সহজেই মান্মূদের অধিকারভুক্ত হইল। দুর্গের কক্ষে কক্ষে রত্নরাজী। সেরূপ রত্ন কেহ কখনও দেখে নাই—স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই। এক একখানি হীরক যেন এক একটী ডালিম ফলের মতন! অন্ধকার নিশীথের উজ্জ্বল তারকার ন্যায় তাহারা প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে! আর স্বর্ণ-রৌপ্যের মুদ্রা ও বিলাসের দ্রব্য যে কত ছিল তাহাতো গণিয়াও স্থির করা যায় না। ভারবাহী উষ্ট্রের দল মরুভূমির মধ্য দিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ-সম্পদ্ বহিয়া লইয়া গেল। গজনীতে যখন এই বিপুল ঐশ্বর্য্য উপস্থিত হইল, তখন উহা দেখিবার জন্য পৃথিবীর লোক যেন সেখানে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

এমন পুরস্কার পাইয়া মান্মূদ ঘরে বসিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। বৎসরের পর বৎসর তিনি হিন্দুস্থানে আসিতে লাগিলেন। কাফের হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করিয়া তিনি ধর্ম্মসাধন করিতেছেন বলিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। মুসলমানজগৎ তাঁহাকে "মূর্ত্তিধ্বংস-কারী" নামে অভিহিত করিল। ধর্ম্মের নামে লোক

অসাধ্য সাধন করিতে পারে। আবার মাক্মূদের অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মকার্য্য করিলে সঙ্গে সঙ্গে ফললাভ। তাই মুসলমান-জগতের সকল স্থান হইতে দলে দলে যুবক আসিয়া তাঁহার সৈন্যরূপে নাম লেখাইতে লাগিল। সুতরাং মাক্মূদের লোকজনের অভাব হয় নাই। প্রত্যেক আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

তখন পঞ্জাব প্রদেশের রাজারা যেমন একতাবদ্ধ হইয়া মাক্মূদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি যদি দিল্লী, কনোজ, আজমীর প্রভৃতি স্থানের নৃপতিগণ মাক্মূদকে একত্রে সংগ্রাম দিতে যাইতেন, তবে কেহই তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিত না। কিন্তু তখন গৃহ-বিবাদ তাঁহাদের বুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়াই ভুলিয়া থাকিলেন। দেশের যে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, সেদিকে তাকাইলেন না।

১০১৮ খৃষ্টাব্দে মাক্মূদ যখন কনোজ জয় করিতে বাহির হইলেন, তখন চারিদিক্ হইতে লোকে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনাই করিতে লাগিল। হিন্দুগণের যিনি পরম শত্রু, তাঁহাকে তাহারা ভীত হইয়া সুহৃদের ন্যায় অভ্য

র্থনা করিতে লাগিল। কাশ্মীরের রাজদূত আসিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইতে লাগিল। নদীর পর নদী পার হইয়া মাহ্মূদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মথুরা তখন সত্যই স্বর্ণপুরী। মথুরা হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের একটী প্রধান কেন্দ্রস্থান। উভয় ধর্ম্মের কত শত দেবমূর্ত্তি সেখানে পূজিত হইত। এক এক বিগ্রহের কোটি কোটি মুদ্রার ঐশ্বর্য্য। সুবর্ণের অলঙ্কার, সুবর্ণের রথ, সুবর্ণের বৃহৎ মন্দির, সুবর্ণের বিলাস উপকরণ—সেখানে সবই সুবর্ণ। মাহ্মূদ মূর্ত্তি-গুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন—ধনরত্ন সব লইয়া চলিলেন। একজন রাজা—নাম তাঁহার চাঁদরায় তিনি নিজের প্রাণ ও অর্থ লইয়া পলায়ন করিতেছিলেন। কিন্তু তিনিও রক্ষা পাইলেন না। মাহ্মূদ তাঁহাকেও ধরিয়া লুণ্ঠন করিলেন।

দুই বৎসর পরে মাহ্মূদ কনোজের রাজার সাক্ষাৎ পাইলেন। আবার যুদ্ধ হইল। আবার হিন্দু হারিল।

ইহার পরই মাহ্মূদের শেষ কীর্ত্তি সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করা। সোমনাথের মন্দিরে ভারতের সর্ব্বত্র হইতে যাত্রীর সমাগম হইত। তাহাদের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত অর্থে সোমনাথ মহাদেবের মন্দিরের ধনভাণ্ডার রাজার

ঐশ্বর্য্যকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। হিন্দুর এই প্রধান তীর্থ যতদিন না ধ্বংস করা যায়, ততদিন মাস্মূদের মনে শান্তি ছিল না। তাই তিনি জাঁকজমক করিয়া শেষবার ভারত আক্রমণে বহির্গত হইলেন। ব্রাহ্মণ উপাসকেরা তো ভাবিয়াই উঠিতে পারেন নাই যে বিধর্ম্মী মুসলমান আসিয়া দেবতার আঙ্গিনায় অত্যাচার করিতে পারে। মহাদেবের রুদ্রতেজে তাহারা ভস্মীভূত হইয়া যাইবে না কি? কিন্তু দেবতা যে তাঁহার ভক্তদের সাহস ও বীরত্বেরই দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করেন, সেকথা তাঁহারা স্মরণ করেন নাই। ভগবান্ তাহাদেরই সহায় হন, যাহারা নিজেরা নিজেদের কাজ করিতে পারে। পঞ্চাশ সহস্র ভক্ত সোমনাথকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণদান করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মাস্মূদ সোমনাথের মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেলেন। মুসলমানেরা তাঁহার এই কার্য্যের জন্য আজও তাঁহাকে তাঁহাদের ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ মনে করেন।

মুসলমানেরা মাস্মূদের সহিত ভারতবর্ষে যাইতেন—ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া আসিতেন। এখানে চিরকালের জন্য বসবাস করিবার কথা তাঁহাদের মনেও

হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষ জয় করা মান্মূদের কাজ ছিল না। আর ভারতবর্ষ জয় করা তো একটী দুইটী যুদ্ধের কথা নহে। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে তখন এদেশ বিভক্ত। একটীকে জয় করিলে, একটুকু ক্ষুদ্র রাজ্য মাত্র পাওয়া যায়। বহু দিনের অক্লান্ত সাধনা ব্যতি-রেকে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার উপায় ছিল না। তবে মান্মূদ পশ্চিমে পঞ্জাব, দক্ষিণে গুজরাত, পূর্ব্বে কনোজ, উত্তরে কাশ্মীর পর্য্যন্ত ভূভাগ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এ সকল অধিকার মোটেই স্থায়ী হয় নাই। কেবলমাত্র লাহোরে তাঁহার বংশীয়েরা তাঁহার মৃত্যুর পরও কিছুকাল রাজ্য করিয়াছিল।

নেপোলিয়ন কোন রাজ্য জয় করিলে, সেখান হইতে ভাল ছবি, কি ভাল খোদাই পাথরের মূর্ত্তি পাইলে, তাহা লইয়া আসিতেন। মান্মূদ তাঁহার অপেক্ষাও সুচতুর ছিলেন। তিনি একেবারে কবি ও শিল্পীকেই গজনীতে লইয়া আসিতেন। পারস্য, খুরাসান্, অক্সাস প্রভৃতি স্থান হইতে সে সময়ের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে মান্মূদ নিজের রাজ্যে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। অল্ বেরুণি নামে একজন পণ্ডিত তাঁহার সহিত আমাদের দেশে আসিয়া ভারতীয়

জ্যোতিষশাস্ত্র ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের যে বিবরণ দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা সে সময়ের ভারতের অনেক বিবরণ জানিতে পারি। পারস্যের মহাকবি ফার্দ্দুসীও তাঁহার রাজসভা আলোকিত করিতেন। মাম্মূদের ন্যায় গুণগ্রাহী সুলতান খুব কমই দেখা যায়। তিনি ফার্দ্দুসীর শাহনামার প্রত্যেকটী শ্লোকের জন্য এক একটী মোহর দিয়াছিলেন। তিনি অর্থলোভী ছিলেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি রসগ্রাহীও ছিলেন। তিনি আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে খুব খারাপ লোক ছিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

তৃতীয় অধ্যায়

সোণার দেশে পাহাড়ের মানুষ।

১০৩০ খৃষ্টাব্দে মাহ্মূদের মৃত্যু হইল। কিন্তু সোণার ভারতে তুর্কীদলের আসা বন্ধ হইল না। এমন কি মাহ্মূদ লাহোরে যে ক্ষুদ্র রাজ্যটী স্থাপন করিয়াছিলেন, সেখানেও মরুভূমির মধ্য হইতে সহস্র সহস্র তুর্কী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা মাহ্মূদের বংশধরদের অধীনতা স্বীকার করিতে রাজী হইল না। ভারতের প্রথম মুসলমান প্রদেশের মধ্যে মহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বীগণের যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

এদিকে আবার পারস্যও মাহ্মূদের বংশধরগণের হস্তচ্যুত হইল। সেখানে নূতন নূতন মুসলমানেরা আসিয়াছিল। তাহারা তুর্কীদিগকে পরাজিত করিয়া পারস্য অধিকার করিয়া লইল। ইহার ফলে মাহ্মূদের পুত্র মসুদের রাজ্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়া পড়িল। মসুদ গজনীতে থাকেন। গজনীর তখন ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। সেই ইন্দ্রের বিভবের মধ্যে মসুদ বিলাসের

স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। মহম্মদ তাঁহার অনু-চরগণকে মদ্যস্পর্শ করিতেও নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানেরা তাঁহার এ আদেশটী পালন করিলেন না! মাহ্মূদ স্বয়ং ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধযাত্রা করিতেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে ও সৈন্যগণ মদ খাইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। মসুদও মদ খাইয়া সময় সময় উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিতেন। কিন্তু তিনি দুর্ব্বল প্রকৃতির ছিলেন না। তাঁহার গায়ে এরূপ জোর ছিল, যে একটী হস্তীকেও তিনি অনায়াসে নিহত করিতে পারিতেন। আর স্থাপত্য-বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। গজনীকে তিনি বহু অট্টালিকাদ্বারা সুশোভিত করিলেন। ভারতের অধিকার মধ্যে শৃঙ্খলা রাখিবার জন্য তাঁহাকে কিন্তু অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। লাহোরের প্রতিনিধি যদি খুব সুদক্ষ ব্যক্তি হয়েন, তবে তিনি হয়তো স্বাধীনতা ঘোষণা করিবেন। আবার দুর্ব্বল ব্যক্তিদ্বারাও রাজ্যশাসন করা চলে না। এই যে প্রতি-নিধি শাসনকর্ত্তা লইয়া সমস্যা ইহা বরাবর মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল। যখনই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা সুবিধা পাইতেন তখনই তাঁহারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিতেন।

মস্থুদের পরে লাহোরে ক্রমাগত বিপ্লব ও বিবাদ চলিতে লাগিল। তাহাতে হিন্দুদের বিশেষ সুবিধা বা অসুবিধা হইল না। তবে হিন্দুরাজগণ যদি একতার মূল্য বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা হয়তো একবার মুসলমানদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। মৌর্য্যবংশের চন্দ্রগুপ্ত যেদিন একক অসহায়ভাবে গ্রীকদিগকে পঞ্জাব প্রদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন, ভারতের সেদিন কি গৌরবেরই না ছিল! আজ আর ভারতবাসীর মনে সে তেজ, দেহে সে বল নাই। তাই মুসলমানেরা অত সহজে, শত অসুবিধা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে অধিকার বিস্তার করিতে পারিলেন।

লাহোরেই মুসলমানগণ সর্ব্বপ্রথমে ভারতবাসী হইলেন। সেখানে তাঁহাদের সভ্যতার সহিত হিন্দুসভ্যতার মিলন হইতে লাগিল, কিন্তু আরবগণের মতন তুর্কীরা তেমন সুসভ্য ছিলেন না। সুতরাং তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে যতটা সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ততটা দিতে পারেন নাই। লাহোরের তুর্কীরাই ভারতীয় ভাষার সহিত তাঁহাদের ভাষা মিশাইয়া উর্দ্দুভাষার সৃষ্টির সূত্রপাত করিলেন।

১০৪৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর রাজা নিজে একবার লাহোর আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সাহস দেখিয়া হিন্দুসৈন্যরাও মনে বল পাইল। তিনি নগরকোট অধিকার করিয়া লইলেন ও লাহোর অবরোধ করিলেন। কিন্তু একদল মুসলমান-সৈন্য অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিলেন। এইরূপে একজন হিন্দুর মুসলমানের হাত হইতে দেশ উদ্ধার করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল।

ইহার কিছুকাল পর পর্য্যন্ত গজনীর বংশ ভারতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে তাঁহাদের নিজের দেশেই এক বিপ্লব উপস্থিত হইল।

অনেকদিন হইতেই গজনী ও হিরাটের মধ্যে ঘোর বলিয়া একটী রাজ্য ছিল। গজনীর মান্মূদ তাহা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ক্রমাগত গজনী ও ঘোরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে থাকে। পরে ১১৬২ খৃষ্টাব্দে সামের পুত্র গয়াসুদ্দীন্—মহম্মদ ঘোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি ইহারি এগার বৎসর পরে গজনী অধিকার করিয়া লইলেন। আর সেই অধিকৃত দেশের শাসনভার মৈজুদ্দিন মহম্মদের উপরে অর্পণ করিলেন। এইরূপে মান্মূদের

সাধের গজনী তাঁহার বংশের অধিকার হইতে চলিয়া গেল।

ঐদিকে প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া ভারতে কোন যুদ্ধবিগ্রহ হয় নাই। হিন্দুগণ মনে করিয়াছিলেন যে মুসলমানেরা আর বুঝি ভারতবর্ষের উপর আক্রমণ করিবেন না। তাই তাঁহারা লাহোরের মুসলমান রাজত্বকে কোনরূপে সহ্য করিয়া লইয়াছিলেন। লাহোরের মুসলমান সুলতানদের কর্ম্মচারীরা অনেকেই হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা মুসলমানদিগকে অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া আনিয়াছিলেন। এমন সময়ে সহসা লাহোরের শান্তি আকাশকুসুমের ন্যায় মিলাইয়া গেল। পাহাড়ের দেশের লোক আসিয়া সোণার ভারত আক্রমণ করিল।

সিন্ধু হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের সকলগুলি দেশ মাহ্মূদ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া গিয়াছেন, আবার ঘোর বংশের মহম্মদঘোরী ঠিক ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ঐ একই প্রদেশগুলির উপর আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। মাহ্মূদ ধনরত্ন লইয়া গজনী সাজাইয়াছিলেন। মহম্মদঘোরী দেখিলেন সে গজনী এখন তাঁহার হাতে। সুতরাং ভারতের ধন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া কোন স্থায়ী ফল হয় না। ভারতের উপরে বসিয়া ভারতের

ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে হইবে। এই সংকল্প লইয়া মহম্মদ-ঘোরী কার্য্যে অগ্রসর হইলেন।

ভারতবর্ষের যে কয়টী স্থান মুসলমানগণের অধিকারে পূর্ব্বেই আসিয়াছে, সেইগুলি হস্তগত করা হইল তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য। আরবেরা সিন্ধুতীরে যে উপনিবেশটী স্থাপন করিয়াছিলেন, সেইটী তিনি প্রথমেই নিজের অধীনে আনিলেন। তাহার পর মুলতান ও গুজরাতে অভিযান করিলেন। ১১৭৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদঘোরী পেশাবার আক্রমণ করিলেন। সেখানকার সুলতান খুসরু মালিক ভীত হইয়া মহম্মদঘোরীর শরণাপন্ন হইলেন। নিজের তুইটী পুত্রকে ঘোরীর নিকট জামিন রাখিয়া বেচারা কোনরূপে জীবন রক্ষা করিলেন। তাহার পর ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদঘোরী একেবারে লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইবার ভারতের গজনী-বংশের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হইল। মহম্মদঘোরীই সে যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। গজনীবংশের শেষ নৃপতি তাঁহার তুই পুত্রের সহিত ঘোরীর নিকট বন্দী হইয়া রহিলেন। পাঁচ বৎসর কারাগারে তুঃসহ জীবন যাপনের পর, তাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পৃথিবী হইতে গজনী-বংশের নাম লোপ পাইল।

এইরূপে ভারতবর্ষে মহম্মদঘোরী সকল প্রতিদ্বন্দ্বীর উচ্ছেদ সাধন করিলেন। এইবার হিন্দুদের রাজ্য আক্রমণের সময় আসিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতার শেষ মুহূর্ত্ত তখন উপস্থিত।

এই দুর্দ্দিনে ভারতমাতা একটী বীর সন্তানকে পাইয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। ইহার নাম পৃথ্বীরাজ। ইহার যেমন ছিল মনের তেজ, তেমনি ছিল দেহের সৌন্দর্য্য। সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার চিরন্তন শত্রু জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তা মোহিত হইয়া গিয়াছিল। কনোজের কুলগত শত্রু পৃথ্বীরাজের গলে বরমাল্য দিতে সংযুক্তা একটুও দ্বিধা বোধ করে নাই। কিন্তু তাহার পিতা জামাতা বলিয়া দিল্লীশ্বরকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই।

মহম্মদঘোরীর গতিরোধ করিবার জন্য পৃথ্বীরাজ সৈন্য-সামন্ত লইয়া উপস্থিত হইলেন। রাজপুত-সৈন্যগণ বংশানুক্রমে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত সম্মুখসমরে জয়লাভ করিতে পারে, এমন বীর ভারতবর্ষে কেহই ছিলনা। মহম্মদঘোরী অনেক দেশ জয় করিয়াছেন—অনেক জাতির সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। কিন্তু
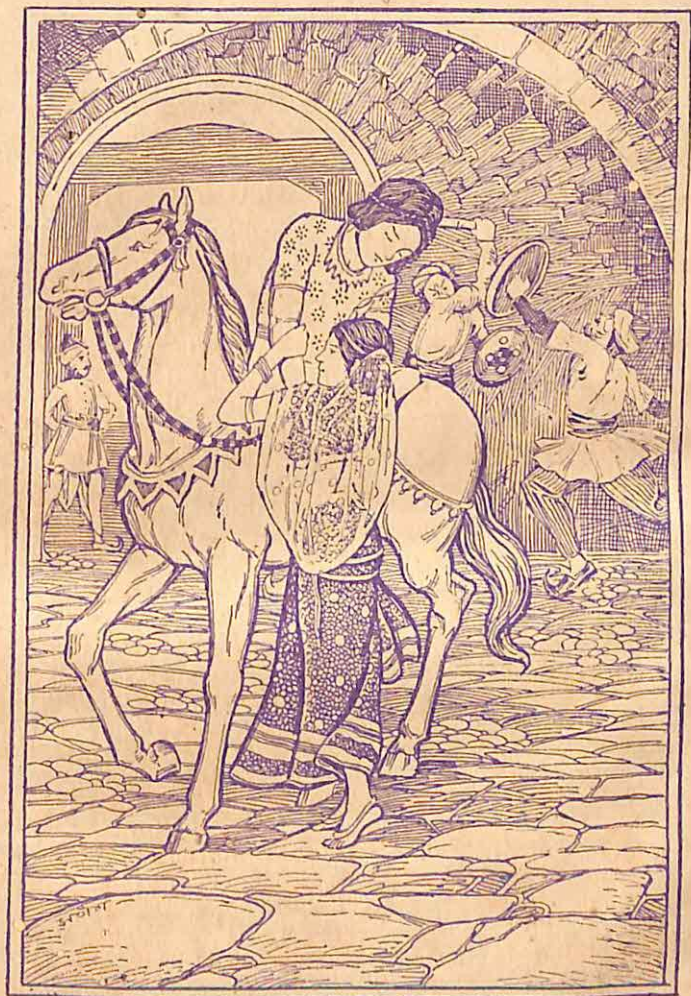
পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে লইয়া পলাইতেছেন।

পৃঃ ৩৬—তুর্কীভারত।
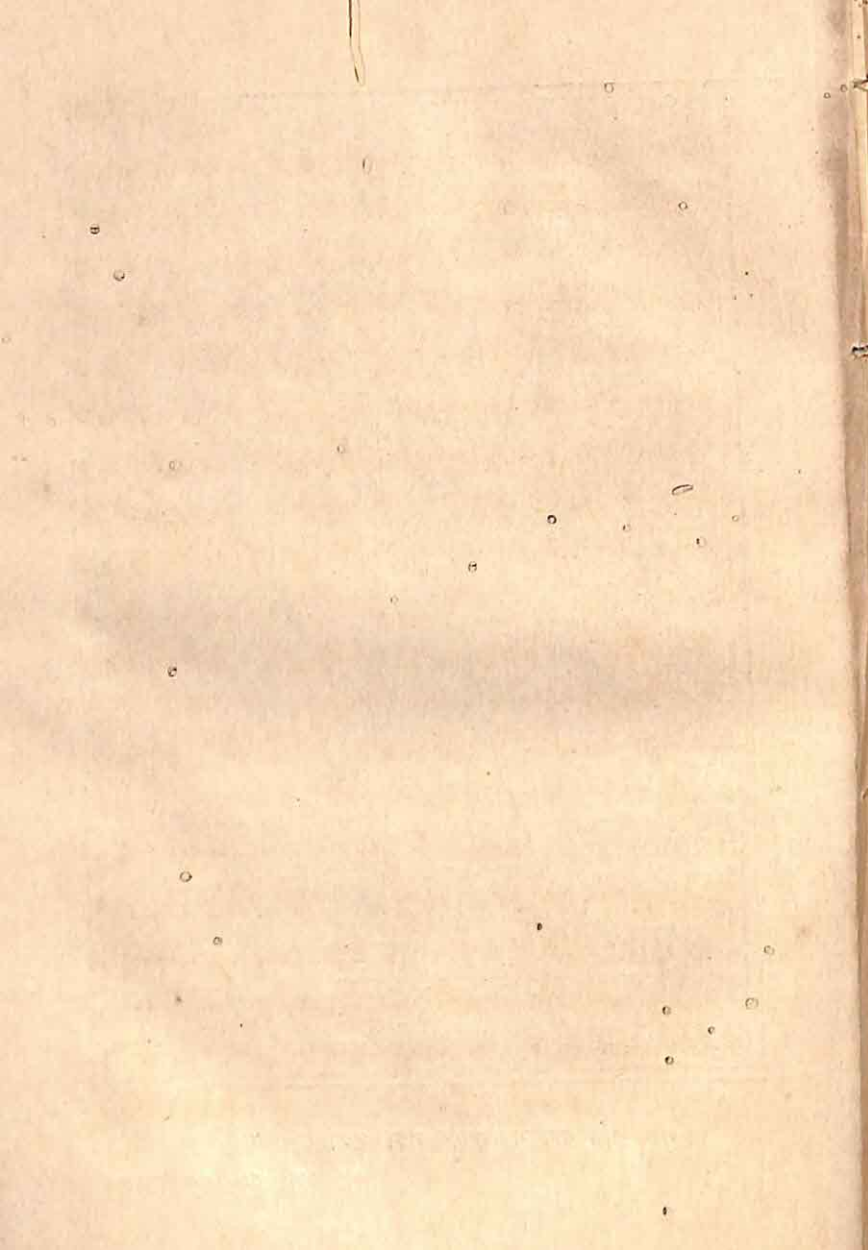
রাজপুতগণ যে কত বড় বীরের জাতি তাহার পরিচয় তিনি জানিতেন না।

পানিপথের নিকটবর্ত্তী নারায়ণ নামক স্থানে হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মুসলমানেরা অশ্ব-পরিচালনার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাই অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা রাজপুতদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু রাজপুত সৈন্য ভয় কাহাকে বলে তাহা জানে না। তাহাদের যুদ্ধ-প্রথাও সম্পূর্ণ অন্য রকমের। তাই মহম্মদঘোরী বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, যে কি করিয়া আক্রমণ করিলে রাজপুতদিগকে পরাজিত করা যায়! রাজপুতেরা কখন কিরূপে সৈন্য সাজাইয়া ফেলে তাহা কেহই ঠিক করিতে পারে না। তাহারা একবার মহম্মদঘোরীকেই ঘিরিয়া ফেলিল। মহম্মদের সৈন্যদল তখন দূরে রহিয়াছে। মহম্মদ ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হইলেন। একা তিনি বিপক্ষ সৈন্য-সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়াছেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন কেবলমাত্র নিজের বীরত্বের উপর নির্ভর করিয়া, তিনি পৃথ্বীরাজের ভ্রাতাকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার বর্ষার আঘাতে রাজভ্রাতার দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু তাহা

দেখিয়া শত শত রাজপুত-সৈন্য একযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। এমন সময়ে খিলিজী-বংশীয় একজন সৈন্য মহম্মদঘোরীকে রণক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া পলায়ন করিল। মহম্মদের পলায়ন দেখিয়া তাঁহার সৈন্যগণ যার পর নাই ভীত হইলেন। তাঁহাদের প্রভুকে এরূপে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে তাহারা কখনই দেখে নাই। তাই তাহারাও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। হিন্দু সৈন্যেরা তাহাদিগকে সহজে ছাড়িল না। প্রায় ৪০ মাইল ধরিয়া তাহারা মুসলমানদিগকে তাড়া করিয়া লইয়া গেল। মহম্মদঘোরী ভয়ে লাহোরে পর্য্যন্ত বিশ্রাম লইলেন না। যত শীঘ্র সম্ভব তিনি সৈন্যগণ সহ সিন্ধু পার হইলেন। কোনরূপে প্রাণটী হাতে করিয়া তাঁহারা দেশে উপস্থিত হইলেন। মুসলমানগণ এমন করিয়া কোথাও কাহারও নিকট পরাজিত হয় নাই।

সুলতান মহম্মদঘোরী এ অপমানের জ্বালা সহজে ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহার আহার নিদ্রা চলিয়া গেল। দিবারাত্র তিনি ভাবিতে লাগিলেন কি করিলে হিন্দুস্থানে আবার নিজের কীর্ত্তি স্থাপন করা যায়। প্রতি পলে, প্রতিক্ষণে, তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এক বৎসরের মধ্যেই—আফগান, তুর্কী ও পারসিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি আবার, ভারত আক্রমণ করিতে বাহির হইলেন। এবার তাঁহার সৈন্যসংখ্যা হইল একলক্ষ কুড়ি হাজার। পঙ্গপালের ন্যায় যাইয়া ভারতভূমিকে তাঁহারা শ্মশান করিয়া ফেলিবেন—ইহাই তাঁহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।

পৃথ্বীরাজ এই এক বৎসরের মধ্যে সরহিন্দ অবরোধ করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে মহম্মদঘোরী নিশ্চয়ই আবার ভারতবর্ষে তাহার অপ-মানের প্রতিশোধ লইতে আসিবে। তাই সেই নারায়ণ-ক্ষেত্রেই তিনি তাহাকে যুদ্ধ দিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এবার মহম্মদঘোরী রাজপুতগণের যুদ্ধযাত্রা-প্রণালী অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই যাহাতে তাহাদিগকে হারাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, সেইরূপ ভাবে নিজের সৈন্য সাজাইলেন। এক এক দিকে দশ হাজার করিয়া অশ্বারোহী রহিল। এইরূপ চারিটী দল একই সময়ে চারিদিক্ হইতে রাজপুতগণকে আক্র-মণ করিল। কিন্তু রাজপুতেরা অচল অটল। কিছুতেই তাহারা একপদও নড়িল না। মহম্মদঘোরী তখন

তিনি তাঁহার প্রভুর স্বদেশ-যাত্রার পর দিল্লী অধিকার করিয়া লইলেন।

ইহার পরের বৎসর মহম্মদ আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। আজমীর ও দিল্লী তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। এখন কেবল কনোজের রাজবংশ বিদ্যমান। সুতরাং তাঁহাকে কিসে নষ্ট করা যায়, সেই চেষ্টা তিনি করিতে লাগিলেন। যমুনার তীরে আবার কনোজের রাঠোর-বংশীয় রাজপুতগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। কনোজরাজ জয়চন্দ্র পরাজিত হইলেন। আজ প্রায় পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া কনোজই ভারতবর্ষে প্রধান শক্তিরূপে বর্ত্তমান ছিল। হর্ষবর্দ্ধনের সাধের কনোজ, যশোবর্ম্মার বুকের রক্ত দিয়া গঠিত কনোজ আজ মুসলমানের হস্তগত হইল। যে কনোজে মরুবাসী গুর্জ্জর প্রতীহার-বংশীয়গণ আসিয়া তাহার সমৃদ্ধিকে আরও শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল, যেখানে ভোজরাজ তাঁহার রাজসভা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই কনোজকে হিন্দুগণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। কনোজ অধিকার করিয়া মুসলমানগণ বিহার পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিলেন। আর বঙ্গদেশে প্রবেশ করিবার সুযোগও সেই দিনই লাভ করিলেন। সুতরাং কনোজ অধিকারের

ফলে ভারতে তুর্কী-শক্তির যথার্থ প্রতিষ্ঠা হইল বলা যাইতে পারে।

কনোজে কত যুগ ধরিয়া কত ধন-রত্ন স্তূপীকৃত হইয়া আসিতেছিল। সেই সমস্ত মুসলমানেরা দখল করিয়া লইলেন। তাহাতে ভারতজয়ের আরও সুবিধা হইল। জয়চন্দ্র নিজেও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন। হিন্দুর মনে তখন এমন অবসাদ আসিয়াছে, যে রাজা কখন প্রাণ হারাইলেন, তাহা তাঁহারা লক্ষ্য পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। যুদ্ধের শেষে রাজদেহ ধূলায় ধূসরিত অবস্থায় পাওয়া গেল। জয়চন্দ্র কৃত্রিম দন্ত ব্যবহার করিতেন—সেই দন্ত দেখিয়াই তাঁহার অনুচরেরা তাঁহাকে চিনিতে পারিল। আর রাঠোরগণ কি করিল জান? তাহারা সত্যই বীরের জাতি। তাহারা সব ছাড়িতে পারে—কিন্তু স্বাধীনতাহীন হইয়া জীবন রাখিতে চাহে না। কনোজে থাকিলে তুর্কীদের পদলেহন করিয়া তাহারা হয়তো সুখেই থাকিতে পারিত। আর তুর্কীরাও তাহাদের মতন বীরকে আদর করিয়া চাকুরী দিত। কিন্তু রাঠোরগণ সে সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কনোজ পরিত্যাগ করিল। যেখানে তাহাদের অপ্রতি-হত প্রভাব ছিল, সেখানে কি আর তাহারা পরের

দাসত্ব করিয়া থাকিতে পারে? মাড়োবারের মরুভূমির মধ্যে বীরহৃদয় রাঠোরগণ চলিয়া গেলেন। আজও সেখানে তাঁহারা বাস করিতেছেন।

কুতব্-উদ্দীন আজমীরে একজন হিন্দুনৃপতিকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। অন্যান্য স্থানের হিন্দুরা ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা মুসলমানের পদলেহনকারী সেই রাজাকে অপসারিত করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গুজরাট ও নাগোরের রাজারা মারগণের সাহায্য লইয়া আজমীর অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। কুতব্-উদ্দীন তখন মহাবিপদে পড়িলেন। গোয়ালিয়রের দুর্গ অবরোধ-কার্য্যে তখন তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। কোন দিক্ রক্ষা করিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে গোয়ালিয়রের পতন হইল। কুতব আজমীরে উপস্থিত হইলেন। আজমীরে প্রবেশ করিবার সময় হিন্দুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। কুতবের দেহ অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। তিনি কোনরূপে আজমীরের দুর্গমধ্যে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। হিন্দুগণ তাঁহাকে তথায় অবরোধ করিয়া রাখিলেন। তখন গজনী হইতে আবার নূতন সৈন্যদল কুতবকে সাহায্য করিবার জন্য

আগমন করিল। সেই সময় তাঁহার ক্ষত প্রায় সারিয়া গিয়াছে। তিনি নবীন উদ্যমে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিলেন। গুজরাটে যাইয়া সেখানকার রাজাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন সংকল্প করিলেন। কিন্তু পথে গুজরাটের দুইজন সামন্ত প্রচুর সৈন্য লইয়া তাঁহার গতিরোধ করিলেন। তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি আবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গুজরাট মুসলমানের করতলগত হইল। কুতব সেখানকার লুণ্ঠন-কার্য্য সমাধা করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পরের বৎসর কুতব বুন্দেলখণ্ডে গমন করিলেন। সেখানে কলিঞ্জর ও কাল্পি নামক দুর্গদ্বয় অধিকার করিয়া লইলেন।

এই সময় কুতব্-উদ্দীনের একজন সুযোগ্য সহকারী ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানের বিজয়-কেতন উড্ডীন করিতে লাগিলেন। ইহার নাম মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার খিলজি। ইনি অযোধ্যা ও উত্তর-বিহার পূর্ব্বেই জয় করিয়া লইয়াছিলেন। এখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। বঙ্গদেশ অবশ্য একদিনে মুসলমানেরা জয় করিতে পারেন নাই। খণ্ড খণ্ড প্রদেশগুলি অধিকার করিতে অনেক বৎসর লাগিয়াছিল।

কিন্তু বক্তিয়ারই বাঙ্গলায় মুসলমান অধিকারের সূত্রপাত করিলেন।

মহম্মদঘোরী যখন গজনীতে নানাপ্রকার যুদ্ধে ব্যাপৃত, সেই সময়ে ভারতবর্ষে একটু বিপ্লবের ভাব দেখা দিল। তাঁহার একজন সেনাপতি মুলতানে আসিয়া মিথ্যা করিয়া বলিল যে ঘোরী তাঁহাকে ঐ রাজ্যের শাসনভার দিয়াছেন। এই বলিয়া সত্যই সে ব্যক্তি মুলতান অধিকার করিয়া লইল। এদিকে আবার মহম্মদঘোরী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, এরূপ গুজবও শুনা গেল। পঞ্জাবের গক্কর নামক এক বীরজাতি একথা শুনিয়া লাহোর অধিকার করিয়া লইল। কেবলমাত্র কুতব্-উদ্দীন মহম্মদঘোরীর বিশ্বস্ত অনুচর রহিলেন।

মহম্মদ এই সব শুনিয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। প্রথমেই তিনি মুলতানের সেই বিশ্বাসঘাতক শাসনকর্তাকে বিদূরিত করিলেন। তাহার পর গক্করদিগকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ভারতবর্ষে মুসলমানধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হইল।

১২০৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে মহম্মদঘোরী সিন্দুতীরে তাঁবু ফেলিয়াছেন। গ্রীষ্মকাল—অসহ্য

গরম। তাই মহম্মদ মৃদুমন্দ বায়ু সেবন করিবার জন্য তাঁবুর বাহিরে বসিয়াছেন। চারিদিকের প্রকৃতির নিস্তব্ধ শোভা তাঁহার মনকে কোন এক স্বপ্নরাজ্যে উধাও করিয়া লইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে অতর্কিত-ভাবে কয়েকজন গক্করজাতীয় সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। ভারতবিজয়ী মহম্মদের জীবন-লীলার অবসান হইল। সুলতান মাহ্মূদের অপেক্ষা মহম্মদঘোরী অনেক বেশী রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। ভারতে মাহ্মূদ দস্যুরূপে দেখা দিয়াছিলেন; আর মহম্মদঘোরী রাজ্য-সংস্থাপকরূপে এখানে আসিয়াছিলেন। কিন্তু মাহ্মূদ ছিলেন একজন আবিষ্কারক—তিনি ভারতবর্ষের অজানাপথে সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন। মহম্মদঘোরী তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারত জয় করিতে পারিয়াছিলেন। মাহ্মূদ যেমন ছিলেন বীর, তেমনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। সেইজন্য আজ মাহ্মূদের নাম সর্ব্বত্র মুসলমানগণের নিকট পূজিত হয়। আর মহম্মদঘোরীর কথা ভারতবাসী ব্যতীত আর সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে।

মহম্মদঘোরী মালব ও তাহার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী প্রদেশ ব্যতীত আর সকল স্থানই অধিকার করিয়া

হিন্দুস্থানে বিরাট্ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করিয়া যাইলেন। সিন্ধু ও বঙ্গদেশ তখনও সম্পূর্ণরূপে বিজিত না হইলেও, শীঘ্রই মুসলমানগণের অধীনে আসিল। গুজরাটের এক রাজধানী ব্যতীত আর কিছুই তাঁহাদের করতলগত হয় নাই। কিন্তু হিন্দুস্থানের অধিকাংশ স্থানই মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা শোভা পাইতে লাগিল।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজসিংহাসনে ক্রীতদাস।

আরব্য উপন্যাসের অসম্ভব ঘটনা ভারতবর্ষে সম্ভব হইল। ক্রীতদাস রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিল। কুতুব্-উদ্দীন মহম্মদঘোরীর ক্রীতদাস ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী ও অনুরক্ত ভৃত্যের উন্নতি হওয়াই স্বাভাবিক। তাই মহম্মদঘোরী মৃত্যুকালে কুতবকে তাঁহার ভারতের সাম্রাজ্য দান করিয়া গেলেন। নাসিরউদ্দীন্ কাবাচা নামে একজন সেনাপতি কেবল সিন্ধু ও মুলতান প্রদেশ লাভ করিলেন।

১২০৬ খৃষ্টাব্দ ভারত-ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। সেই দিনই আমাদের দেশে দিল্লীর সিংহাসনে তুর্কী সাম্রাজ্যের যথার্থ প্রতিষ্ঠা হইল। ৩২০ বৎসর ধরিয়া তুর্কীরা আমাদের দেশ শাসন করিলেন। তাহার পর মোগলকুলতিলক বাবর পাণিপথের যুদ্ধে তুর্কীর হাত হইতে ভারত-সাম্রাজ্য গ্রহণ করিলেন।

তুর্কী ভারত

মুসলমানেরা ভারতের জনসমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া যাইবেন ইহাই তখনকার হিন্দুরা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তুর্কীদের মধ্যে যে একতা ছিল, তাহারই গুণে তাহারা মুষ্টিমেয় হইয়াও ভারতের বিপুল হিন্দুসমাজের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিয়াছিল। আজও আবার যদি ভারতকে উন্নতির পথে চলিতে হয় তবে হিন্দুমুসলমানে একতাসূত্রে বদ্ধ হওয়া প্রয়োজন হইবে।

তুর্কীদের মধ্যে ধর্ম্মান্ধতা ছিল, কিন্তু তাহারই বলে তাহারা শক্তিমান্ হইতে পারিয়াছিল। তুর্কীদের সম্রাট্ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য মুটিয়া পর্য্যন্ত সকলেই এক আসনে বসিয়া ভগবানকে উপাসনা করিতে পারে। আর হিন্দুদের নিকট হইতে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য, তাহারা সকলে মিলিয়া হিন্দুদিগকে দমন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। আর ধর্ম্ম প্রচার করিলে পুণ্য হইবে এরূপ ভাবও অনেকের মধ্যে ছিল। তাই তাহারা হিন্দুদিগকে মুসলমান করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেক হিন্দু তাহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ফলে মুসলমানদিগের সাম্রাজ্য ভারতে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

কুতব্-উদ্দীন যখন নানাস্থানে যুদ্ধ করিতেছিলেন,

তৎকালে তাঁহার সহিত হাসান নিজামি নামে একজন ঐতিহাসিক থাকিতেন। তিনি কুতবের রাজ্যশাসন-প্রণালী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কুতব কাহারও উপর অবিচার করিতেন না। তিনি দুর্ব্বলকে প্রবলের হাত হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেন। তাঁহার ভয়ে "বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত"। পথে দস্যুভয় নিবারণ করিবার জন্য কুতব যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কুতব অত্যন্ত দানশীল ছিলেন—লোকে এজন্য তাঁহাকে লক্ষটাকা-দাতা বলিয়া অভিহিত করিত।

তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগও ছিল অসাধারণ। সকল মুসলমান যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে ভগবানের উপাসনা করিতে পারে, সেজন্য তিনি দিল্লীতে সুপ্রসিদ্ধ জম্মা-মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। আর নিজের স্মৃতি অক্ষয় করিবার জন্য এক বিরাট্ স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ স্তম্ভই কুতবমিনার নামে পরিচিত। জগতের মধ্যে এত বড় স্তম্ভ আর কোথাও নাই। প্রথমে এটী ২৫০ ফিট্ উচ্চ ছিল। ইহার কারুকার্য্য দেখিয়া আজও দেশ বিদেশের লোক মুগ্ধ হইতেছে। চিত্রে তোমরা ইহার প্রতিকৃতি দেখিতে পাইবে।

কুতব্-উদ্দীন সিন্ধু ও মুলতানের অধীশ্বর নাসিরুদ্দীন

কুবাচকে নিজের ভগিনী দান করিয়া তাঁহাকে বন্ধু করিয়া লইলেন। নিজের কন্যাকে গজনী প্রদেশের অধিপতি জলদুজের সহিত বিবাহ দিলেন। অপর এক কন্যার পাণিগ্রহণ কে করিল তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে। সে একজন ক্রীতদাস। তাহার নাম আলতামাশ। আলতামাশ কুতবের বড় প্রিয়পাত্র ছিল। কুতব তাঁহার নিজের জীবনের কাহিনী স্মরণ করিয়া আর কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। গুণীর গুণেরই তিনি আদর করিতেন—তাহার জাতিকুলের বিচার রাখিতেন না। আলতামাশের মধ্যে তিনি প্রতিভার বিকাশ দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাকে কন্যাদান করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। এরূপ ঘটনা তুর্কীদের মধ্যে প্রায়ই ঘটিত।

কুতব নিজে অধিকদিন নূতন সাম্রাজ্য ভোগ করিতে পারিলেন না। চারিবৎসর পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার পুত্রকে সকলেই অযোগ্য মনে করিলেন। দিল্লীতে তখন সবে নূতন রাজ্য গঠিত হইতেছে। কর্ম্মঠ শক্তিশালী ব্যক্তির হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা প্রয়োজন। তাই আলতামাশকে সকলেই রাজসিংহাসন প্রদানে সম্মত হইলেন।

ক্রীতদাস কুতবের উত্তরাধিকারী হইলেন ক্রীতদাস আলতামাশ।

আলতামাশই প্রকৃতপক্ষে দিল্লীর দাসবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁহার বুদ্ধি ও বীরত্বের প্রভাবে রাজ্যের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। কিন্তু সে সময়ে বিপদ চারিদিক্ হইতে ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। আলতামাশ নিপুণ কর্ণধারের ন্যায় ভারতের রাজনৈতিক তরণী পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

গজনীতে তখন অলদিজ সুলতান। তিনি আলতামাশের কার্য্যকলাপের পরিচয় পাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে এ ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে লাভ করিতে পারিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। তাই তিনি রাজছত্র ও দণ্ড উপহারস্বরূপে দিল্লীতে আলতামাশের নিকট প্রেরণ করিলেন।

লাহোরই মুসলমানগণের ভারতবর্ষে আধিপত্যের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্রস্থান। কিন্তু তখনও লাহোর দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে নাই। আলতামাশ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কি করিলে লাহোর হস্তগত করা যায়। লাহোরের অধিপতি কুবাচ কিছুতেই

তাঁহার হাতে উহা সমর্পণ করিতে রাজী হইলেন না। আলতামাশ বারংবার কুবাচের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১২৬৭ খৃষ্টাব্দে কুবাচকে পরাস্ত করিয়া আলতামাশ উত্তর-পঞ্জাবের অধীশ্বর হইলেন। দিল্লীর তুর্কী সাম্রাজ্য এইরূপে ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

এই সময় ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। এতকাল যে সকল মুসলমান এদেশে আসিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে সুসভ্য। কিন্তু আলতামাশের রাজত্বকালে সর্ব্বপ্রথমে মোগলজাতীয়েরা এদেশে আসিতে লাগিলেন। পৃথিবীর যে জাতি যখনই পরাক্রমশালী হইয়া উঠে, তখনই তাহার মনে ভারতের অফুরন্ত ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিবার বাসনা জাগ্রত হয়। মোগলেরা যেমন অসভ্য, তেমনি অমানুষিক রকম নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে তাহারা যেন প্লাবনের ন্যায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহারা যেখানে যাইত, সেখানে আর লোকালয়ের চিহ্ন থাকিত না। তাহারা লোকজনকে বন্দী করিত, হত্যা করিত, পশুপালকে খাইয়া ফেলিত, শস্যক্ষেত্র পুড়াইয়া

দিত। এইরূপ অত্যাচার করিতে করিতে তাহারা নব নব দেশের অভিমুখে অভিযান করিত।

সুপ্রসিদ্ধ মোগলনেতা চেঙ্গিসখাঁ ভারতবর্ষের অভিমুখে আসিলেন। সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত তাঁহার সৈন্যদলের লুণ্ঠন ও অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। খারিজামের অধিপতি তাঁহার ভয়ে পলাইয়া আলতামাশের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। আলতামাশ দেখিলেন তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়া মানেই বিপদকে আহ্বান করিয়া আনা। তাই তিনি খাঁরিজামের অধিপতিকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। চেঙ্গিসখাঁ সিন্ধুপ্রদেশে রাজ্য অধিকার করিলেন। কিন্তু পারস্যের সুবর্ণ তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল। তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া পারস্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমাদের দেশ যেন রাহুর গ্রাস হইতে মুক্তি পাইল। কিন্তু মোগল-আক্রমণের এই সবে আরম্ভ। ইহার পরে বার বার মোগলজাতি আমাদের দেশে উৎপাত করিতে আসিতে লাগিলেন।

চেঙ্গিসখাঁয়ের আক্রমণের ফলে আলতামাশের কিছু সুবিধাই হইল। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাসিরুদ্দীন কুবাচ চেঙ্গিসখাঁ কর্ত্তৃক পরাভূত হন। সুতরাং চেঙ্গিস-

খাঁর ভারত ত্যাগের পরে, কুবাচের রাজ্য জয় করিয়া লওয়া আলতামাশের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছিল। গজনীর অলদিজও চেঙ্গিসের আক্রমণে সিংহাসনভ্রষ্ট হইলেন। এখন আর আলতামাশের প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানদের মধ্যে প্রাচ্য জগতে কেহ রহিল না।

বাঙ্গলাদেশ ভারতবর্ষের একটী কোণে। তাই দিল্লী হইতে সর্ব্বদা ইহার শাসন করা সম্ভবপর হইত না। এখানকার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা একটু সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেন। কুতবের মৃত্যুর পর এইরূপ একজন শাসনকর্ত্তা বঙ্গদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি নিজ নামে মুদ্রা পর্য্যন্ত চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এমন সময়ে আলতা-মাশ যাইয়া তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। বাঙ্গলাদেশ আবার দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিল। (১২২৫ খৃষ্টাব্দ)। ১২৩৪ খৃষ্টাব্দে আলতামাশ্ মালবদেশ জয় করিতে গমন করিলেন। মালবের রাজধানী সেই সুপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী হিন্দুদের কত সুখ কল্পনা, কত গৌরবস্মৃতি ঐ উজ্জয়িনীর সহিত বিজড়িত। কিন্তু তাহাও আলতামাশের বীরত্বপ্রভাবে মুসলমানগণের

অধীনে আসিল। বিন্ধ্যপর্ব্বতের পরপারেও তুর্কীর বিজয়-ধ্বজা উড্ডীন হইল।

আলতামাশের বীরত্ব-কাহিনী, তাঁহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের কথা দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। বোগদাদের খলিফা এরূপ একজন পরাক্রান্ত মুসলমান নৃপতিকে সম্মান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি একদল দূতের সহিত রাজোচিত বেশ-ভূষা পাঠাইয়া আলতাম্বাশকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর আলতা-মাশই যে হিন্দুস্থানের একমাত্র অবিসম্বাদিত অধীশ্বর তাহাও মুসলমান-জগতের ধর্ম্মগুরু মানিয়া লইলেন। ইহার পর হইতে আলতামাশ তাহার মুদ্রার উপর লিখিতে লাগিলেন "বিশ্বাসী ভক্তগণের অধিনায়কের সহায়ক"। ইহার পূর্ব্বে তিনি লিখিতেন "প্রবল প্রতাপ সুলতান, সাম্রাজ্য ও ধর্ম্মের ভাস্কর বিজয়ীবীর ইল্-তু-মাশ্"। এখন এই উভয় উপাধি লিখিবার জন্য তাঁহার মুদ্রাগুলি বৃহদাকার হইল। রৌপ্যমুদ্রায় ঐ লিপি অঙ্কিত হইতে লাগিল। এরূপ রৌপ্যমুদ্রা একহিসাবে এদেশে নূতন। ইহার পূর্ব্বে মুসলমান সুলতানগণ দেশীয় প্রথায় মুদ্রা অঙ্কন করিতেন। তাহার এক পৃষ্ঠে নাগরী অক্ষর ও অপর পৃষ্ঠে আরবী লিপি থাকিত।

মুদ্রার চিহ্নস্বরূপ শিবের ষণ্ড বা চোহানগণের অশ্বারোহী পুরুষ অঙ্কিত থাকিত। কিন্তু আলতামাশ এ সকল একেবারে পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। তিনি মুদ্রায় আরবীপ্রথা প্রচলন করিলেন। তবে একহিসাবে তাঁহাকে ভারতবর্ষের মুদ্রার প্রবর্ত্তক বলা চলে। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে রৌপ্যতঙ্কা ব্যবহার করেন। ইহা হইতেই পরে ১৭৫ গ্রেণ ওজনের তঙ্কা হইয়াছিল। তাহার ক্রমবিকাশের ফলেই আবার বর্ত্তমান টাকার উৎপত্তি হইয়াছে।

আলতামাশ যখন মুলতান পরিদর্শন করিবার জন্য গমন করিতেছিলেন, তখন সহসা তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। (১২৩৬ খৃষ্টাব্দ)।

আলতামাশের মন্ত্রী অতি বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারই মন্ত্রণাগুণে আলতামাশ অনেক সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। পারসীক ভাষায় রচিত "জামা-উল্-হিকায়ৎ" নামক ঐতিহাসিক গল্পের বইয়ের লেখক আলতামাশের সভায় বাস করিতেন। ইহা হইতেই আলতামাশের বিদ্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

আলতামাশ লোক চিনিতেন—গুণীর আদর জানিতেন। তিনি বুলবন্ নামক একজন ক্রীতদাসকে

অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে বুলবন্ ক্রীতদাস হইলেও, তাহার মধ্যে প্রতিভার বহ্নি আছে। বুলবনের পিতা দশসহস্র লোকের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু বুলবন্ বাল্যকালেই দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত হয়েন। বুলবন্ বিক্রয়ার্থ আলতামাশের সমক্ষে নীত হইলে, আলতামাশ বুলবনকে দেখিয়া পছন্দ করিলেন না। কেননা বুলবনের চেহারা মোটেই ভাল ছিল না। বুলবন্ দেখিলেন তাঁহার জীবনের উন্নতির শ্রেষ্ঠ সুযোগ চলিয়া যায়। তিনি সুলতানকে বলিলেন "জগৎপতি! আপনি এত ক্রীতদাস কিনিয়াছেন কাহার জন্য?" আলতামাশ বলিলেন "কেন? তাকি তুমি বুঝ না? আমার নিজের সুখ-সুবিধার জন্য।" তখন বুলবন্ কাতরভাবে বলিলেন "প্রভু তাহা হইলে আমাকে ভগবানের সেবার জন্য ক্রয় করুন।" আলতামাশ হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আচ্ছা তাই হোক্।" বুলবন্ প্রথমে ভিস্তির কাজে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু যাহার বুদ্ধি থাকে, সে সকল অবস্থা হইতেই উন্নতি করিতে পারে। বুলবন্ ঐ সামান্য পদ হইতে ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলেন। আলতামাশের মৃত্যুকালে তিনি একজন প্রধান ওমরাহ হইয়াছিলেন।

আলতামাশের আর একটী কার্য্যে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বিদুষী সুন্দরী কন্যা রিজিয়ার মধ্যে তিনি রাজ্যশাসনের ক্ষমতার বিকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন। মুসলমানগণের মধ্যে নারীর সম্মান যথেষ্ট থাকিলেও, নারীকর্ত্তৃক শাসিত হওয়া তাঁহারা অত্যন্ত অপমানজনক মনে করেন। মহম্মদ বলিয়া গিয়াছেন "যে জাতি নারীকে শাসনকর্ত্তার পদ দিবে, সে জাতির মুক্তি হইবে না"। এরূপ নিষেধবাক্য থাকা সত্ত্বেও আলতামাশ তাঁহার কন্যাকে রীতিমত রাজ-কার্য্যে সুশিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রেরা ছিল অকর্ম্মণ্য, বিলাসপ্রিয়। তাই যখন আলতামাশ কোনও বিদেশে অভিযান করিতে যাইতেন, তখন রাজ্যভার রিজিয়াকে দিয়া যাইতেন। আসিয়া দেখি-তেন রিজিয়ার পরিচালনার একটুও ত্রুটী বা বিচ্যুতি নাই। সেই জন্য তিনি আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর সুলতানা রিজিয়াই সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন।

কিন্তু আলতামাশের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রুকু-নুদ্দীনই সুলতান হইলেন। তিনি নৃত্যগীত লইয়াই মত্ত থাকিতেন। তাঁহার মাতাই সাম্রাজ্য পরিচালনা

করিতেন। কিন্তু মাতা এত বেশী অত্যাচার করিতে লাগিলেন, যে সাত মাস রাজত্বের পরই মাতা-পুত্রে উভয়ে বন্দী হইলেন। ওমরাহগণ তখন একবাক্যে রিজিয়াকে সুলতানার পদ প্রদান করিলেন।

ভারতবর্ষে নারীর রাজ্য-পরিচালনার দৃষ্টান্ত এই নূতন নহে। তবে এতবড় সাম্রাজ্য আর কোনও ভারতীয় নারী কখনও পরিচালনা করেন নাই। এই জন্য রিজিয়ার জীবন-বৃত্তান্ত জানিবার আমাদের এত আগ্রহ। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কেবল ভারতবর্ষে নহে, মুসলমান-জগতের সর্ব্বত্রই নারীর কর্তৃত্ব চলিতেছিল। এমন ব্যাপার আর মুসলমানদের মধ্যে কখনও হয় নাই। যে সালাদীন তাঁহার বীরত্ব ও মহত্বে য়ুরোপীয়-গণকে ক্রুজেডের যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাঁহা-রই দৌহিত্রের পত্নী এই সময়ে মিশরে মামলুকগণের উপর রাজত্ব করিতেছিলেন। এই মহীয়সী মহিলার নাম সজর-অদ্-দার। ইনি প্রথমে ক্রীতদাসী ছিলেন, পরে রাজপত্নী হইয়াছিলেন। তিনি নারী হইয়াও য়ুরোপীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি নবম লুইকে ইনিই পরাজিত করেন, এবং দয়াপরবশ হইয়া ইহার জীবনরক্ষা করেন।

অপর একজন মুসলমান-মহিলার নাম আবিল। তিনি ফার নামক প্রদেশ এই সময়েই শাসন করিতেছিলেন। সে সময়ে মোগল-আক্রমণের দুরন্ত ঝটিকার মধ্যেও তিনি রাজ্যটীকে ২৫ বৎসর কাল ধরিয়া সুপরিচালিত করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু রিজিয়ার ভাগ্য এতটা সুপ্রসন্ন ছিল না।

রিজিয়া নারী হইয়াও পুরুষের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। পুরুষবেশে যখন সুলতানা রিজিয়া অশ্বে আরোহণ করিয়া ভ্রমণে বাহির হইতেন, তখন সকলে বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত। তাঁহার রূপের প্রভায় চারিদিক্ যেন আলোকিত হইত। মুসলমান-মহিলার পক্ষে পর-পুরুষের নিকট মুখের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা ঘোরতর অন্যায়কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু রিজিয়া এ সকল লৌকিক সংস্কার মানিলেন না। তিনি প্রকাশ্য রাজসভায় বসিয়া বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভারতের ওমরাহগণ এই প্রতিভাশালিনী রমণীর কৃতিত্ব দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন।

আলতামাশ বলিতেন যে রিজিয়া কুড়িজন বেটাছেলের চেয়েও বুদ্ধিমতী। সত্যই কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার পরিচয় পাওয়া গেল। ফেরিস্তা বলিয়াছেন যে সুল-

পুরুষবেশে রিজিয়া প্রকাশ্য রাজসভায় বিচার করিতেন।

পৃ ৬২ তুর্কীভারত।
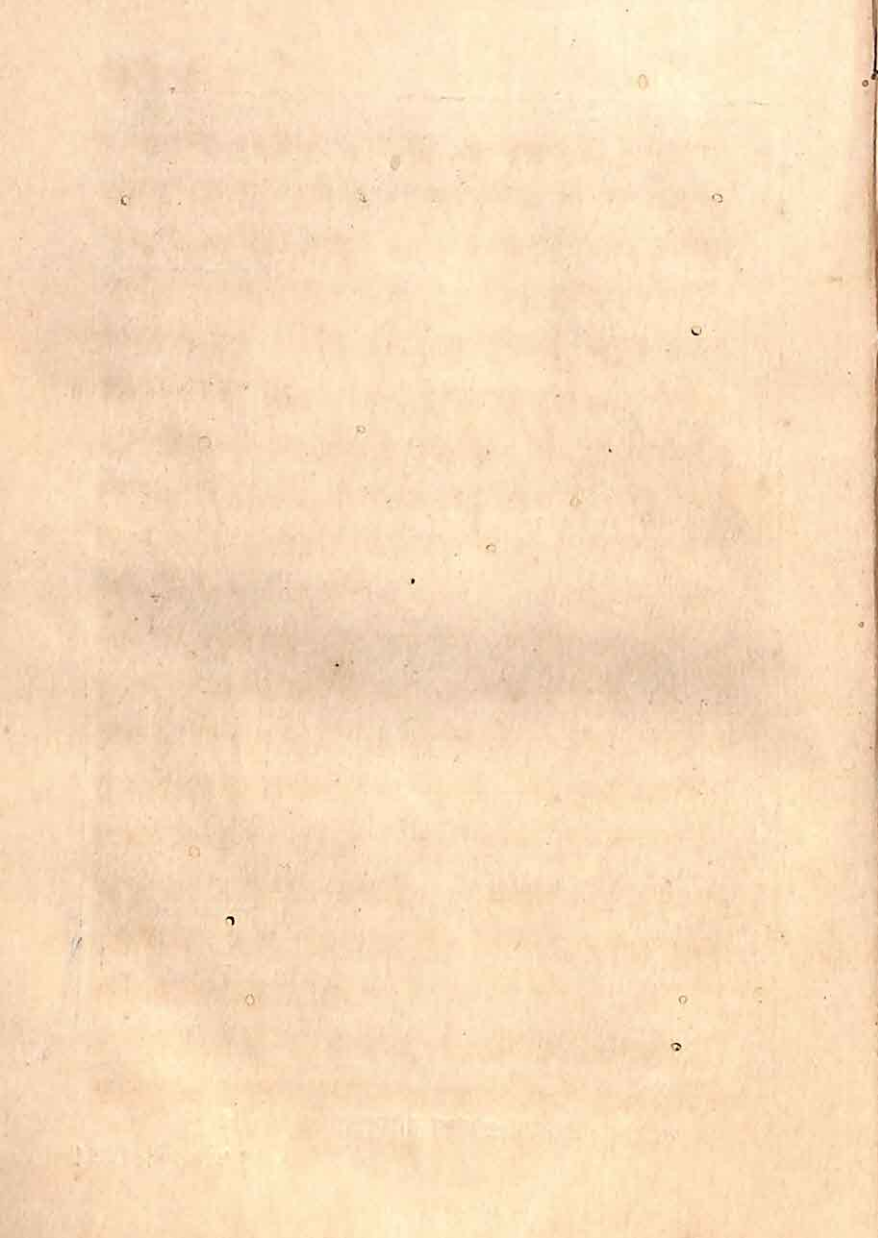
তানগণের যে সকল গুণ থাকিলে তাঁহারা খ্যাতিলাভ করিতে পারেন, রাজ্য-সুশাসন করিতে পারেন, তাহার সকলগুলিই রিজিয়ার মধ্যে ছিল। রিজিয়া বিশুদ্ধ-ভাবে কোরাণের বয়াৎ পাঠ করিতে পারিতেন। ফেরিস্তা আরও বলেন যে যদি কোন সমালোচক রিজিয়ার চরিত্র ও গুণাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া দোষ ধরিতে যান, তবে রিজিয়া স্ত্রীলোক এই দোষ ছাড়া আর কোন দোষ তাঁহার মধ্যে পাইবেন না। একজন নারীর পক্ষে এ প্রশংসা লাভ করা বড় কম গৌরবের কথা নহে।

কিন্তু ঐ দোষেই রিজিয়া মারা গেলেন। প্রথমে তাঁহার ভ্রাতাই তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন। রিজিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। তাহার পরে আবার প্রধান মন্ত্রী জুনেদি কয়েকজন প্রধান প্রধান ওমরাহকে সঙ্গে লইয়া লাহোর হইতে দিল্লী অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে দিল্লীর কর্ম্মচারীদিগকে পর্য্যন্ত তাঁহারা বিদ্রোহী করিয়া তুলিবেন। কিন্তু রিজিয়ার সহিত বুদ্ধিতে পারিয়া উঠা দায়। তিনি বিদ্রোহী-নেতাদের মধ্যে ভেদ বাধাইতে লাগিলেন। শীঘ্রই তাঁহার কূট-নীতির ফলে বিদ্রোহীরা

ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। বিদ্রোহী-নেতাদের মধ্যে কয়েক-জন কারাবন্দীও হইলেন।

এইবার বিপদমুক্ত হইয়া রিজিয়া খোজা মেহদি গজনবীকে নিজাম-উল্-মুলক উপাধি দিয়া উজীরের পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে কুতুব-উদ্দীন হুসান নামে সেনাপতি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন জুমাল-উদ্দীন ইয়াকুৎ নামে একজন হাবসী ক্রীতদাস আমির-উল্-উমরার পদ লাভ করিলেন। হয়তো রিজিয়া গুণের আদর করিয়াই তাঁহাকে ঐ পদ দিয়া ছিলেন। কিন্তু লোকের মনে সামান্য একজন ক্রীতদাসের এরূপ উন্নতি দেখিয়া ঈর্ষ্যা উপস্থিত হইল। তাহারা নানারূপ কুৎসা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এই সময়ে তুর্কী-ক্রীতদাসগণের মধ্যে যাহারা স্থলতানের প্রিয়পাত্র ছিল, তাহারা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের নাম ছিল "চল্লিশ"। এই "চল্লিশের দল" সকল স্বাধীন ও সহৃদয় ব্যক্তিদিগকে রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া নিজেরাই সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করিয়া বসিল।

তাহারা রাণীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। রিজিয়া প্রথমে তাহাদিগের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করিয়া

দিলেন। কিন্তু অবশেষে তাহাদের সহিত আর পারিয়া উঠিলেন না। তাহারাই তাঁহাকে বন্দিনী করিল। ১২৪০ খৃষ্টাব্দে আলতুনিয়ার অধিনায়কত্বে এই ব্যাপার ঘটিল। কিন্তু ইহাতেও রিজিয়া দমিলেন না। তিনি তাঁহার সৌন্দর্য্যের মোহে আলতুনিয়াকে ভুলাইলেন। আলতুনিয়া তখন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন, উভয়ের বিবাহ হইল। বিবাহের পর উভয়ে মিলিয়া রাজ্য করিতে বসিলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে অন্যান্য ওমরাহরা রিজিয়ার ভ্রাতাকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। রিজিয়া সৈন্য-সংগ্রহ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পারিলেন না। সকলে শেষ সময়ে সুলতানা রিজিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। দিল্লীর বিদ্রোহীদল তাঁহাকে বধ করিল। কিন্তু ইন্-বাতুতা বলেন যে রিজিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের বেশে যুদ্ধ করিতে করিতে পলায়ন করেন। পথের মধ্যে একস্থানে তিনি ক্ষুধায় ও পিপাসায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। একজন কৃষক তাঁহাকে কিছু রুটী ও জল খাইতে দিল। রিজিয়া ক্লান্তির পর আহার পাইয়া নিদ্রিতা হইলেন। তাঁহার বস্ত্রের নিম্নে বহু মূল্যের আভরণ ছিল। কৃষক তাহা দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে হত্যা করে।

এইরূপ ভারতের একমাত্র সম্রাজ্ঞী মাত্র সাড়েতিন-বৎসর রাজত্ব করিয়া ইহলোক হইতে অপসারিতা হইলেন। রিজিয়ার পর তাঁহার ভ্রাতা বহ্‌রাম ও ভ্রাতুষ্পুত্র মাস্‌দ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। তাঁহারা উভয়েই দুর্ব্বলপ্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন।

কিন্তু তখন দুর্ব্বল লোক দিয়া রাজকার্য্য চালাইবার সময় নহে। মোগলেরা তখন পঙ্গপালের ন্যায় আসিয়া পুনঃপুনঃ ভারত-আক্রমণ করিতেছে। ভারতবাসী এমন একজন সম্রাট্‌ চাহে, যিনি তাহাদিগকে এই সকল শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন ও দেশমধ্যে শান্তিস্থাপন করিতে পারিবেন।

ঠিক এই সময়েই এইরূপ একজন ব্যক্তির অভ্যুদয় হইল। কুতব ও আলতামাশের ন্যায় তিনিও ক্রীতদাস ছিলেন। আলতামাশের তৃতীয় পুত্র নাসিরুদ্দীন তখন সম্রাট্‌ পদে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তিনি রাজকার্য্যের সমস্ত ভারই বুলবনের উপর দিয়াছিলেন। আলতা-মাশের মৃত্যুর পর হইতে মাস্‌দের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত নাসিরুদ্দীন কারারুদ্ধ ছিলেন। কারাগারে বসিয়া

তিনি কোরাণের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন—সাধারণের অর্থে জীবন ধারণ করা তিনি ঘৃণ্য বোধ করিতেন। রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়াও তিনি এই রীতি পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার হারেমে বহু বেগম ছিল না—কেবলমাত্র একজন পত্নী লইয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। যেমন ছিলেন স্বামী, তেমনি ছিলেন স্ত্রী। স্ত্রী কোন দাস-দাসীর সাহায্য না লইয়া স্বহস্তে স্বামীর জন্য আহার প্রস্তুত করিতেন। নাসিরুদ্দীন্ তাহাই খাইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। নাসিরুদ্দীন্ বুলবন্‌কে সহকারী-উজীর করিবার সময়ে শুধু বলিয়া ছিলেন "তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও, কেবল ভগবানের নিকট তাহার উত্তর দিতে হইবে এই কথা মনে রাখিও।" বুল্‌বনও প্রভুর এই আদেশ সর্ব্বদা মনে রাখিয়া কাজ করিতেন।

তুর্কী-রাজ্যের মধ্যে গৃহ-বিবাদ দেখিয়া হিন্দুগণ সর্ব্বত্র মাথা তুলিয়াছিলেন। বুলবনের প্রথম কর্ত্তব্যই হইল হিন্দু-বিদ্রোহের দমন। বৎসরের পর বৎসর তিনি দোয়াব, রণস্তম্ভগড়, মালব, কালিঞ্জর প্রভৃতি স্থানে অভিযান প্রেরণ করিতে লাগিলেন, সর্ব্বত্রই তিনি বিজয়ী হইলেন। তাঁহার পরাক্রমবলে তুর্কীর সাম্রাজ্য

আবার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার সফলতায় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া অন্যান্য ওমরাহরা কত ষড়যন্ত্র করিল। কিন্তু বুলবন্ না হইলে আর সাম্রাজ্য চলে না। বুলবন্ও প্রাণপণ করিয়া প্রভুর কার্য্য উদ্ধার করিতে লাগিলেন।

তখন মোগলেরা ভারতবর্ষ দখল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। বুলবন্ দেখিলেন, তাহাদিগকে আসিবার পথেই বাধা দিতে না পারিলে, বিপদ্ আরও গুরুতর হইয়া উঠিবে। তাই তিনি তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতাকে প্রত্যন্তসীমায় শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করিলেন। তিনি সেখান হইতেই মোগলদিগকে হটাইয়া দিতে লাগিলেন।

১২৬৬ খৃষ্টাব্দে নাসিরুদ্দীনের মৃত্যু হইল। তখন তুর্কী-সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ বুলবন্ই রাজপদে আরোহণ করিলেন। সেই জন্য রাজ্যের ব্যবস্থা যেমন চলিতেছিল, তেমনই থাকিল। কিন্তু নাসিরুদ্দীন দয়ালু-হৃদয় ছিলেন। তিনি অনেক সময়ে বুলবনের কঠোরতাকে নিষ্ঠুর বলিয়া দমন করিতেন। এখন আর বুলবনের উপর কেহ কথা বলিবার রহিল না। সুতরাং সাম্রাজ্যের মধ্যে বুলবন্ দৃঢ় ও কঠোর হস্তে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

সে সময়ে কঠোরতা অবলম্বন না করিলে আর উপায় ছিল না। বিপদ্ চারিদিক্ হইতে ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে। তুর্কী-ওমরাহগণ ও সুলতানের ক্রীতদাসেরা প্রতিক্ষণে বুলবনের ক্ষমতা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের ষড়যন্ত্রকে অঙ্কুরে বিনাশ করিতে না পারিলে, অন্য সকল কার্য্যই পণ্ড হইয়া যাইবে। আবার দিল্লীতে তখন ভয়ানক দস্যুর উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। লোকের ধন-রত্ন লইয়া বাস করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ভিস্তী-রমণীরা রাজপথে জল ছিটাইতে পর্য্যন্ত পারে না—তাহাদের বড় ভয় যে দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাদের উপর অত্যাচার করিবে। মোগ-লেরা তো ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে। তাহার উপর আবার হিন্দুগণ চারিদিক্ হইতে মাথা তুলিয়াছে। তাহাদিগকেও দমন করিতে হইবে। এই সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্যই বুলবন্ অত কঠোরভাবে শাসনকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার নিযুক্ত শান্তিরক্ষকেরা দিল্লীতে আবার শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিল। তাঁহার সৈন্যেরা দিল্লীর চতুর্দ্দিকস্থ বনানি পরিষ্কার করিয়া ফেলিল।

দস্যুদলের আর লুকাইয়া রহিবার স্থান থাকিল না। রাজপথের মধ্যে যাহাতে কোন অত্যাচার না হইতে পারে, সেজন্য মধ্যে মধ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার রাজ্যের ঐতিহাসিক বরণী বলেন যে বুলবনের ঐরূপ চেষ্টার ফলে ষাট বৎসরের মধ্যে আর পথে দস্যু দেখা যায় নাই।

যেমন দস্যুদিগকে বুল্‌বন শাস্তি দিলেন, তেমনি তুর্কী জমীদারগণের উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিলেন। তিনি তাঁহাদের সকলের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু বহু অনুরোধে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়েন। মোগলগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে এই আশঙ্কায় বুলবন্ তুর্কী-সৈন্যদলকে যতদূর সম্ভব সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদিগকে সেনাপতির কার্য্য দেন নাই। মোগলের আক্রমণকে দিল্লীবাসিগণ প্রতিমুহূর্ত্তে ভয় করিত। এই ভীতি যে কিরূপ প্রবল হইয়াছিল, তাহা আমীর খস্‌রুর কবিতা পাঠ করিলে বুঝা যায়। খস্‌রু বুলবনেরই রাজসভায় বাস করিতেন। মোগলেরা কখন দিল্লীর উপর আসিয়া পড়ে, তাহার কিছুই স্থিরতা ছিল না। সেই জন্য বুলবন্ কোন দূর-দেশে অভিযান করিতে যাইতেন না।

কেবল বঙ্গদেশে তাঁহাকে কয়েকবার আসিতে হইয়াছিল। বাঙ্গলার লোকেরা চিরদিনই একটু বিদ্রোহ-প্রবণ ছিল। এখানকার শাসনকর্ত্তারাও সুবিধা পাইলেই সর্ব্বদা স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন। মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার খিলজীর পর ক্রমান্বয়ে ১৫ জন শাসনকর্ত্তা বাঙ্গলাদেশ শাসন করেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই দিল্লীর অধীনতা মাথা পাতিয়া স্বীকার করেন নাই। আলতামাশ একবার তাঁহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর হইতে আবার বাঙ্গলায় বিপ্লব চলিতেছিল।

বাঙ্গলার পঞ্চদশ শাসনকর্ত্তা তুঘ্‌রিলখাঁর বিরুদ্ধে কয়েকবার অভিযান প্রেরণ করিবার পর বুলবন্ তাঁহাকে দমন করিতে সমর্থ হয়েন। বুলবন্ বড় নিষ্ঠুরভাবে বাঙ্গলার বিদ্রোহিগণকে শাস্তি দিয়াছিলেন। বুলবন্ তাঁহার পুত্র বঘ্‌রা খাঁ মাহ্মূদকে সেই কঠোর দণ্ড দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মাহ্মূদ! দেখিলে?" মাহ্মূদ বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বুলবন্ আবার বলিলেন "মাহ্মূদ! দেখিলে? যদি তুমি কোন দিন কাহারও কথা শুনিয়া দিল্লীর সিংহা-

সনের বিরুদ্ধে দাঁড়াও, তাহা হইলে তোমার কপালেও ঐরূপ শাস্তি আছে।" রাজ্যরক্ষা বিষয়ে বুলবন্ পুত্রকেও শাস্তি দিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। বঘ্‌রা খাঁ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। বুলবনের মৃত্যুর পর তিনবৎসরের মধ্যে দিল্লী হইতে তাঁহার বংশের অধিকার লোপ পাইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে তাঁহার বংশধরেরা শান্তিতে আরও পঞ্চাশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বুলবনের জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার মতনই বীর ছিলেন। তিনি মোগলদিগকে দিপালপুরের নিকটে হারাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই যুদ্ধেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। বুলবন্ পুত্রের বিয়োগে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তিনি যে শোক পাইলেন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। (১২৮৭ খৃষ্টাব্দ)।

বুলবন্ কঠোর ভাবে শাসন করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক তাঁহাকে রক্তপিপাসু বলিয়াছেন। বুলবন্ কখনও জীবনে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন নাই বা তাঁহার নিকট কাহাকেও ঐ ভাবে হাসিতে দেন নাই। চল্লিশ বৎসর কাল ভারতের তিনি ভাগ্যবিধাতা ছিলেন এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তিনি আমাদের দেশের অনেক

উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। তুর্কী-সম্রাট্গণের মধ্যে তাঁহার নাম সবিশেষভাবে স্মরণীয়।

বুলবনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী কোন দেশেই পাওয়া কঠিন। যাঁহারা নিজে সকল কার্য্য করেন, তাঁহাদের অধীনে কেহ কোন কাজ শিখিতে পারে না। সুতরাং বুলবনের মৃত্যুর পর যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

বুলবনের দ্বিতীয় পুত্র বাঙ্গলার সুখ-বিলাস ছাড়িয়া আসিতে চাহিলেন না। বঘ্‌রাখাঁর পক্ষে দিল্লীর বিপদসঙ্কুল সিংহাসন অপেক্ষা বাঙ্গলার শান্তিময় নিভৃত নিকুঞ্জই ভাল বোধ হইল। পিতা যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তিনি তাঁহাকে ফেলিয়া বাঙ্গলায় চলিয়া আসিলেন। বুলবন্ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের পুত্রকে রাজ্য দিয়া পরলোকে গমন করিলেন।

কিন্তু ওমরাহগণ তাঁহাকে মানিল না। তাহারা বঘ্‌রার পুত্র কৈকুবাদকে সম্রাট্ করিল। কৈকুবাদ তখন মাত্র ১৭ বৎসরের বালক। সাম্রাজ্যের কি বুঝিবেন? বুলবন্ তাঁহাকে ভদ্রভাবে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন—কঠোরভাবে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিয়া-

ছিলেন। তাই বেচারা কখনও একটু স্ফূর্ত্তি করিতে পারে নাই। এই সতের বৎসর বয়সের মধ্যে একটী সুন্দরী বালিকার মুখ পর্য্যন্ত তাহার চোখে পড়ে নাই। এক চুমুক মদও সে স্পর্শ করিতে পায় নাই। এখন সেই হইল বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। সুতরাং সে যে এবার প্রাণ ভরিয়া আনন্দ করিবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

কৈকুবাদ বিলাসের পঙ্কে একেবারে নিমগ্ন হইলেন। একজন মন্ত্রী কঠোরভাবে রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি রাজ্য মধ্যে শৃঙ্খলা রাখিতে পারিলেন না। সুতরাং চারিদিক্ হইতে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই বিপদের সময় কৈকুবাদের পিতা বঘ্রা খাঁ একবার বাঙ্গলাদেশ হইতে ছেলের চরিত্র সংশোধন করিতে আসিলেন। অবশ্য তিনি নিজেও যে খুব সাধু-পুরুষ ছিলেন তাহা নহে। তবুও তো তিনি পিতা—উপদেশ দিবার অধিকার তাঁহার আছে।

কিন্তু পিতা হইতেছেন এখানে একজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা—আর পুত্র তাঁহারই সম্রাট্। সুতরাং পিতাকে রীতিমত কুর্নিশ করিতে করিতে পুত্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইল। ইহা দেখিয়া কৈকুবাদের

মন গলিয়া গেল। তিনি যাইয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। পিতা-পুত্রে মিলন হইল।

কিন্তু কৈকুবাদের চরিত্র সংশোধন হইল না। তিনি যেমন চলিতেছিলেন, তেমনি চলিতে লাগিলেন। এক-জন ঘাতক ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে গেল। তখন কৈকুবাদ বিলাসাগারে রহিয়াছেন। সেখানকার অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ঘাতক দেখিল সম্রাট্ এককোণে পড়িয়া আছেন। তিনি ইহার পূর্ব্ব হইতেই পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছিলেন। এখন একেবারে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কৈকুবাদের জীবন-লীলার অবসান করিয়া ঘাতক চলিয়া গেল।

পঞ্চম অধ্যায়

দক্ষিণাপথে মুসলমান

তুর্কীদের সহিত অনেক পাঠান আমাদের দেশে আসিয়াছিল। পাঠানেরা আফগানবংশসম্ভূত। আফগানিস্থানে তাহাদের বাস। অনেক তুর্কী আবার আফগানিস্থানে বসবাস করিত। তাহারা পাঠানদিগের সহিত বিবাহাদি করিয়াছিল। এইরূপ এক মিশ্র সঙ্কর বংশ হইতেছে খিলজী। খিলজীরা খুব সম্ভবতঃ তুর্কী। কিন্তু আফগানিস্থানে বাস করিয়া তাহারা পাঠান হইয়া গিয়াছিল। এই খিলজী বংশেরই একজন—মহম্মদ-ই বক্তিয়ার বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। খিলজীদের মধ্যে অনেকেই দিল্লীর রাজ-সরকারে উচ্চকর্ম্ম করিতেন।

কৈকুবাদের মৃত্যুর পর জলাল্‌উদ্দীন নামক একজন খিলজী বিদ্রোহী দলের প্রতিনিধি হইলেন। তিনি একজন বড় সেনাপতি ছিলেন। এখন কৌশল করিয়া নিজেই রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। লোকে ইহাতে বড়ই গোলমাল করিতে লাগিল। কোন খিলজী

এ পর্য্যন্ত সম্রাট হয়েন নাই—এখন নূতন রকম ব্যবস্থা চলিবে ইহা তাহাদের নিকট ভাল বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু ইহাদের বাধা সত্ত্বেও খিলজীরা সাম্রাজ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। খিলজী-বংশে ছয় জন সুলতান ত্রিশ বৎসর ধরিয়া রাজ্য করেন। তাহার মধ্যে একজন পরাক্রমশালী সম্রাট কুড়ি বৎসর কাল রাজ্য করিয়া ভারতে মুসলমান রাজ্য আরও বর্দ্ধিত করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে দাক্ষিণাত্যে মুসলমানের বিজয়-কেতন উড্ডীন করিলেন।

জলাল্‌উদ্দীন যখন সুলতান হইলেন, তখন তাঁহার বয়স সোত্তর বৎসর। ইহকালের সুখ-ঐশ্বর্য্য ভোগ করা অপেক্ষা, পরকালের ভাবনায় তিনি তখন অধিক ব্যস্ত। তাঁহার স্বভাবটী বড় মৃদু, হৃদয় অত্যন্ত করুণা-শীল। বিদ্রোহীরা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিল। তিনি তাহাদিগকে ধরিলেন। কিন্তু রাজ-সভায় তাহা-দিগকে আনিয়া নিজের তরবারী বিদ্রোহীনেতার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"ক্ষমতা থাকে তো তোমরা আমাকে হত্যা কর"। বিদ্রোহীরা জলাল্‌-উদ্দীনের এইরূপ নৈতিক সাহস দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। তিনি তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট

করিয়া বিদায় দিলেন। জলাল্‌উদ্দীন কাহাকেও কখনও কঠোর শাস্তি দিতে পারিতেন না,—করুণায় তাঁহার মন গলিয়া যাইত।

কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্মে ত্রুটী ছিলনা। ১২৯২ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুতীরে মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহা-দিগকে তিনি বিতাড়িত করিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাল্‌উদ্দীনকে বড়ই স্নেহ করিতেন। আলাল্‌উদ্দীন নিজে প্রতিভাবান্ যুবক ছিলেন। খুল্ল-তাতের সকল কাজেই তিনি সহায়তা করিতেন। সেই-জন্য জলাল্ তাঁহাকে আরও আপন করিয়া লইবার জন্য নিজের কন্যার সহিত আলাল্‌উদ্দীনের বিবাহ দিলেন। কিন্তু যে পর, সে পরই থাকিয়া যায়। সম্বন্ধে কিছু আসে যায় না। আলাল্‌উদ্দীনের হাতেই জলাল্ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

আলাল্‌কে জলাল্‌উদ্দীন কারা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি সেখান হইতেই সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগিয়াছে। কি করিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেই ভাবনায় তিনি মগ্ন। প্রচুর অর্থ, বৃহৎ সৈন্যদল না

হইলে দিল্লী অধিকার করা অসম্ভব। এ সকল তিনি পাইবেন কোথায় ?

সহসা তাঁহার মনে হইল ভারতের অপর অর্দ্ধেক ভাগে মুসলমান তখনও পদার্পণ করে নাই। হিন্দুরা সেখানে অগাধ ঐশ্বর্য্য লইয়া মহাসমারোহে এখনও রাজ্য করিতেছে। যদি বিন্ধ্যপর্ব্বত পার হইয়া ঐ দেশ আক্রমণ করা যায়, তাহা হইলে মাহ্মূদের ন্যায় আলাল্‌উদ্দীনও প্রচুর ধনরত্নের অধীশ্বর হইতে পারেন।

দাক্ষিণাত্যে তখন কয়েকটী হিন্দু রাজা নানা প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দেবগিরির রাজা রামদেব। তিনি মহারাষ্ট্র-ভূমির অধিপতি। আলাল্‌উদ্দীন তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন বলিয়া বাহির হইলেন। কিন্তু কি অসীম সাহস তাঁহার! সঙ্গে মাত্র সাতশত লোক লইয়া তিনি নূতন রাজ্য আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন! যদি সম্মুখযুদ্ধে রাজ্য জয় করার অভিপ্রায় তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে তিনি এরূপ করিতেন না। মিথ্যার আশ্রয় লইয়া কৌশল করিয়া রাজ্য জয় করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তাই তিনি প্রথমেই প্রকাশ করিলেন যে খুল্লতাতের সহিত

তাঁহার বিবাদ হইয়াছে। তিনি দাক্ষিণাত্যের কোন রাজার অধীনে চাকুরী খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন।

দেবগিরির রাজা এই কথায় বিশ্বাস করিলেন। তাই অতর্কিতভাবে আলাল্‌উদ্দীন তাঁহার রাজ্য আক্রমণের সুবিধা পাইলেন। রামদেব একটী গিরিদুর্গে পলায়ন করিলেন। সেখানে আবার শুনিলেন যে আলাল্‌উদ্দীনের বহুসহস্র অনুচর তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে। রাজা ভীত হইয়া পড়িলেন। মনে অত ভয় থাকিলে যুদ্ধ জয় করা যায় না। রাজা হারিলেন। আলাল্‌উদ্দীন তাঁহার নিকট হইতে ইলিচপুর প্রদেশ গ্রহণ করিলেন—আর যে কত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনিলেন, তাহা গণিয়া উঠাই কঠিন।

দিল্লীতে জলাল্‌উদ্দীন তো এই সংবাদ শুনিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন। স্নেহ ও প্রীতিতে তাঁহার হৃদয় উছলিয়া উঠিল। তিনি অগ্রসর হইয়া আলাল্‌উদ্দীনকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। আলাল্‌উদ্দীন সেই স্নেহের উপযুক্ত প্রতিদান দিলেন—তিনি তাঁহাকে হত্যা করিলেন। আলাল্‌উদ্দীনের দিল্লীর রাজমুকুট পরিবার সাধ পূর্ণ হইল।

আলাউদ্দীন্ দিল্লীতে আসিয়া দুই হাতে ধনরত্ন

বিতরণ করিতে লাগিলেন। বড় বড় লোককে উপাধি দিলেন। সকলে যাহাতে তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হয়, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিই ছিল যথেচ্ছাচারী। তিনি সহসা ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়া ফেলিতেন। সেইজন্য তাঁহার উপর লোকে কখনও খুসী হইতে পারে নাই। তাঁহার রাজ্যকালে বিদ্রোহের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

তিনি প্রথমেই গুজরাত আক্রমণ করিলেন। সেখানে হিন্দুরাজা স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এবারে যে তিনি গুজরাত অধিকার করিলেন, তাহাতেই সেখানে মুসলমান রাজত্ব স্থায়ী হইয়া গেল। তাহার পর মোগলদের আক্রমণে ভারতবর্ষ বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। ১২৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩০৫ পর্য্যন্ত এই নয় বৎসর কাল আলাউদ্দীন্ তাহা লইয়াই ব্যস্ত রহিলেন। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে মোগলনেতা কুতলুঘ খোজা একেবারে দিল্লীর উপর আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এত লোক আসিয়াছিল যে পথ চলিবার উপায় পর্য্যন্ত ছিল না। রাজধানীও রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। এমন সময় একজন ওমরাহ আলাউদ্দীন্‌কে

উপদেশ দিল যে শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া ফেলুন। সুলতান রাগিয়া বলিলেন "আজ যদি আমি এদের কাছে মাথা নত করি, তবে কাল আমি অন্তঃপুরে মুখ দেখাইব কি করিয়া! প্রজারাই বা আমাকে মানিবে কেন? মরি সেও ভাল, তথাপি সম্মানের সহিত রাজ্যরক্ষা করিতে যাইয়া প্রাণ দিব।"

পরদিন দিল্লীর অদূরে কিলির ময়দানে দুইলক্ষ মোগলের সহিত আলাউদ্দীনের ভীষণ যুদ্ধ হইল। তাঁহার অশ্বারোহী-সৈন্যের বীরত্বে বিস্মিত হইয়া মোগলেরা পলায়ন করিল।

মোগলেরা অনেকদিন হইতেই সোণার ভারতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই দিল্লীতে বসবাস করিতেছেন। তাহারা যে পাড়ায় বাস করিত, তাহার নাম ছিল মুগলপুর। তাহারা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও আলাউদ্দীন্ তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিলেন না। আলাউদ্দীনের আদেশে সকল মোগলকে একদিনে হত্যা করা হইল। বালক ও স্ত্রীলোক সুলতানের ক্রোধবহ্নি হইতে নিস্তার পাইল না। এরূপ নিষ্ঠুরতা ইতিপূর্ব্বে আর কেহ বড়

একটা করেন নাই, বলিয়া ঐতিহাসিক বরণী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

আলাউদ্দীন্ এইবার শত্রুহীন হইয়াছেন মনে করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার রাজকোষ তখন ধনরত্নে পরিপূর্ণ। তাঁহারই সৈন্যদল ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তিনি নিজে বিজয়-গৌরবে মত্ত হইয়াছেন। তিনি নিজে নামটী পর্য্যন্ত প্রথমে সহি করিতে পারিতেন না। অন্যান্য সুলতানেরা যেমন অনেক কবি ও বিদ্বান্ লোক রাজসভায় রাখিতেন, আলাউদ্দীন্ সেরূপ করিতেন না। স্তাবকের দল সর্ব্বদা তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত। এরূপ অবস্থায় তিনি যে নিজেকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ মনে করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আলাউদ্দীন্ মনে করিলেন তাঁহার মতন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আর নাই। তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত দূত। জগতে নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য তাঁহার আবির্ভাব। তাই তিনি নব-ধর্ম্মের বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অপরদিকে আবার আলাউদ্দীন্ ভাবিলেন তিনি সেকেন্দরশাহের মতন পৃথিবী জয় করিয়া লইবেন। এই জন্য "দ্বিতীয় সেকেন্দরশাহ" উপাধিও গ্রহণ করি-

লেন। ঐশ্বর্য্য যে মানুষকে কতদূর উন্মত্ত করিয়া তুলিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত তোমরা আলাউদ্দীনের জীবনেই দেখিতে পাইতেছ।

আলাউদ্দীনের একজন কোতোয়াল ছিলেন অত্যন্ত বিজ্ঞ। তিনি সুলতানকে বুঝাইয়া দিলেন যে ঐ সকল উন্মত্তপ্রয়াস ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহার কর্ত্তব্য ভারত-শাসনের ব্যবস্থা করা। ভারতবর্ষ বিস্তৃতদেশ একটী মহাদেশ বলিলেও চলে। এইটী জয় করিতে পারিলেই, তাঁহার তৃপ্ত হওয়া কর্ত্তব্য। আলাউদ্দীন্ এই উপদেশ গ্রহণ করিলেন।

আলাউদ্দীন্ প্রথমেই রণস্তম্ভগড় বা রণথম্বর দুর্গ অধিকার করিতে গমন করিলেন। সে দুর্গটী ছিল দুর্ভেদ্য। সুতরাং এই একটী ক্ষুদ্র কার্য্য হইতেই সুলতান বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার পক্ষে জগৎজয়ের আশা কিরূপ বাতুলতা। কৌশলসহকারে এক বৎসর পরে তিনি দুর্গটী অধিকার করেন।

এই দুর্গ অবরোধের সময় সুলতানের বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। যাহাতে আর এরূপ না হইতে পারে, সুলতান এইবার তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিয়ম করিয়া দিলেন যে ওমরাহগণ পরস্পর আদান-

প্রদান করিয়া বিবাহ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারিবেন না। এমন কি তাঁহারা সমবেত হইয়া কোন যুক্তি-পরামর্শও করিতে পারিবেন না। আর আলাউদ্দীন্ বুঝিয়াছিলেন যে লোকে সুরাপান করিয়াই সকল প্রকার গর্হিত আচরণ করিয়া থাকে। সেইজন্য তিনি দিল্লীতে সুরা বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিলেন। ওমরাহরা যাহাতে প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি না হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থাও তিনি করিলেন।

এই সকল নিয়মের ফলে অনেকেই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল।

আলাউদ্দীন্ হিন্দুদিগকে বড়ই নির্য্যাতন করিতেন। তাঁহারা যাহাতে গৃহে অশ্ব বা অস্ত্র রাখিতে না পারে, কোনরূপ বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করিতে না পারে—সেইরূপভাবে তাহাদিগকে নির্য্যাতন করা হইতে লাগিল। চিরদিন আমাদের দেশে ছয় ভাগের একভাগ কর লওয়া হইত। আলাউদ্দীন্ উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক গ্রহণ করিতে লাগিলেন। গোচারণের নিষ্কর মাঠগুলির উপর নূতন কর বসিল। নির্য্যাতন যে কিরূপ ভীষণভাবে চলিয়াছিল, তাহা সেই যুগের ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীনের

কথাতেই তোমাদিগকে বলিতেছি—"প্রজারা সুলতানের কঠোর শাসনে এমন উৎসাহবিহীন, সাহসশূন্য হইয়াছিল, যে একজন রাজকর্ম্মচারীই কুড়িজন চৌধুরী, ঘুতস ও মুকাদ্দিমের গলায় দড়ি দিয়া টানিয়া আনিতে পারিতেন। কোন হিন্দুই মাথা তুলিতে পারিতেন না। তাহাদের ঘরে সোণারূপা বা অন্য কোন প্রকার স্বচ্ছলতার চিহ্ন দেখা যাইত না। সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহিলারাও পেটের দায়ে মুসলমানের বাড়ীতে কাজ করিয়া খাইতেন।" কিন্তু আলাউদ্দীন্ তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকেও তেমনি শাসনে রাখিয়াছিলেন। তাহারা যে রাজস্ব আদায় করিতে যাইয়া প্রজা ও সুলতানকে ঠকাইয়া নিজেরা লাভবান্ হইবে, সে উপায় ছিল না। সেকালে কেরাণীদিগকে বোধ হয় খুব পরিশ্রম করিতে হইত—আর তাহারা অত্যন্ত সামান্য বেতন পাইত। সেইজন্য তাহাদের সহিত কেহ কন্যার বিবাহ দিতে চাহিত না।

আলাউদ্দীন্ নিজে সকল প্রকার বাজারদর ধার্য্য করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা অপেক্ষা কম বা বেশী মূল্যে কেহ কোন জিনিষ বিক্রয় করিতে পারিত না।

তাহার পর সুলতান আবার জয়াকাঙ্ক্ষায় বাহির হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন চিতোরে পৃথিবীর সুন্দরী-

প্রজারা সুলতানের কঠোর শাসনে এমন উৎসাহ বিহীন, সাহসশূন্য হইয়াছিলেন, যে একজন রাজকর্ম্মচারীই কুড়িজন চৌধুরী কুতব ও মুকাদ্দিমের গলায় দড়ি দিয়া টানিয়া আনিতে পারিতেন।
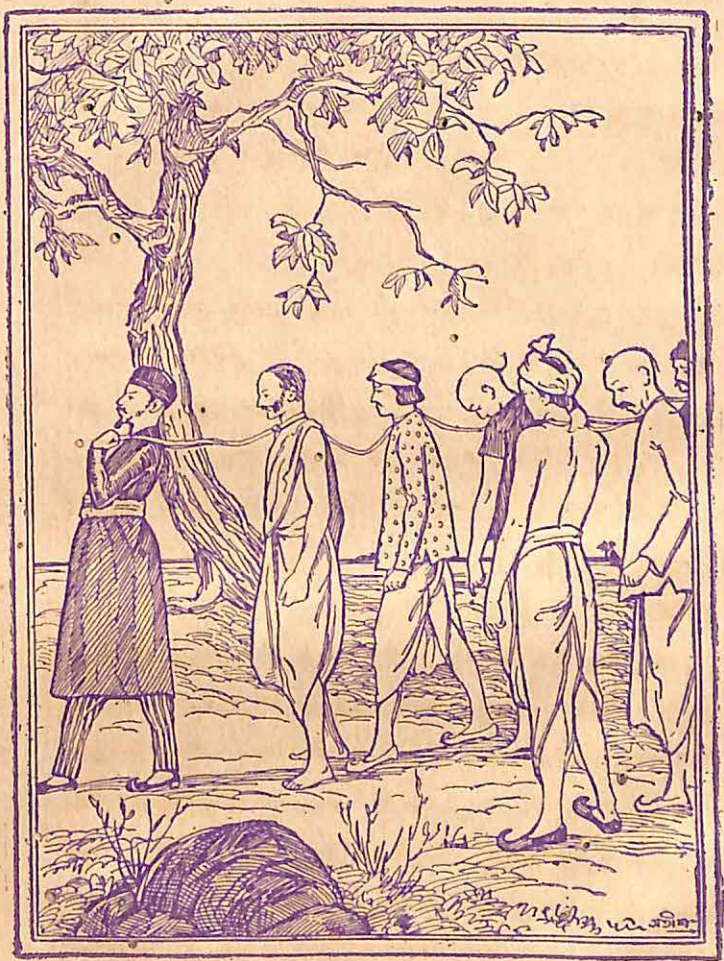
পৃ ৮৬ তুর্কীভারত।
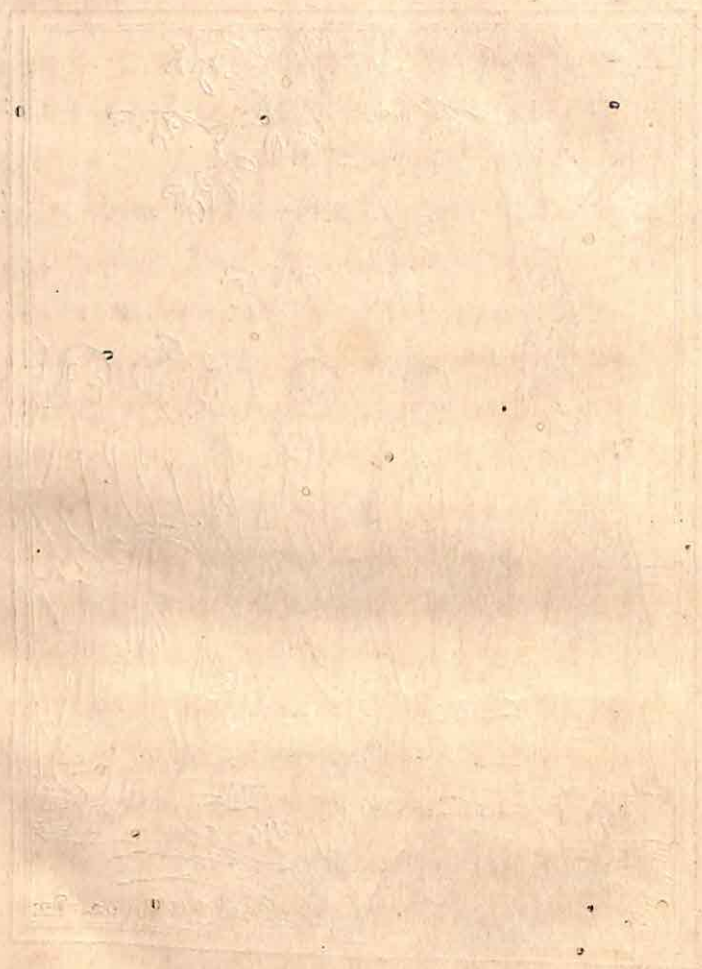
কুলশিরোমণি পদ্মিনী বাস করে। তাঁহার আলোক-সামান্য রূপ সন্দর্শন ও রাজপুত-রাজ্য জয় এই দুই কারণে তিনি চিতোরে অভিযান প্রেরণ করিলেন। প্রথম বারে তিনি চিতোরের কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় চিতোর মুসলমানের করায়ত্ত হইল বটে, কিন্তু পদ্মিনী জহরব্রত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। চিতোরের অবরোধ-কাহিনী, রাজপুতের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, রাজপুত মহিলা-গণের স্বদেশের জন্য অম্লানবদনে জীবনদান—এই সকল কথা উপন্যাস অপেক্ষাও মনোরম।

তাহার পর আবার আলাউদ্দীন্ দাক্ষিণাত্য জয় করিবার জন্য বাহির হইলেন। তখন দেবগিরিতে রামদেব আবার স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য আলাউদ্দীন্ মালিক কাফুর নামে একজন খোজা সেনাপতি প্রেরণ করিলেন। কাফুর যেমন ছিলেন বীর, তেমনি ছিলেন আলা-উদ্দীনের প্রতি বিশ্বাসী। তিনি পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন, কিন্তু রাজ-অনুগ্রহলাভের আশায় মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইয়াছিল। কাফুর রামদেবকে অনায়াসে পরাজিত করিলেন।

তাঁহার পুত্রের সহিত তাঁহাকে ধরিয়া দিল্লীতে আনিলেন। আর যুগে যুগে সঞ্চিত দাক্ষিণাত্যের অর্থরাশিও তাহার সঙ্গে আসিল। আলাউদ্দীন্ কিন্তু বন্দী রাজাকে যথোচিত সম্মান করিলেন। তাঁহাকে রাজাধিরাজ উপাধি প্রদান করিলেন। আর একলক্ষ তঙ্কা উপহার দিয়া দেবগিরিতে প্রেরণ করিলেন। সেই স্থান হইতে তিনি তখন আলাউদ্দীনের অধীনরূপে শাসন করিতে লাগিলেন। সুলতানের এই ব্যবহারটী ঠিক সেকেন্দরশাহেরই অনুরূপ হইয়াছে বলিতে হইবে। সেকেন্দরশাহও বিখ্যাত রাজা পুরুকে ঐরূপে সম্মান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে আকবরও এই নীতির অনুসরণ করিয়া মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এইরূপে দক্ষিণাপথেও মুসলমানের অধিকার স্থাপিত হইল।

ইহার পরের বৎসর কাফুর কাকতেয়বংশের রাজার রাজধানী জয়ের আশায় বাহির হইলেন। রামদেব বিশ্বস্ত অনুচরের ন্যায় তাঁহার সহায়তা করিলেন। বরঙ্গলের অধিপতি কাফুরের নিকট বহু ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। রাজা প্রতিবৎসর কর দিতেও স্বীকৃত হইলেন। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে

কাফুর আবার মলবার প্রদেশে গমন করিয়া দ্বারসমুদ্র নামিক পুরাতন রাজধানী আক্রমণ করিলেন। সেখান হইতেও তাঁহারা বিপুল ধনরাশি লুণ্ঠন করিয়া আনিলেন। মলবারের হিন্দুমন্দিরগুলিও তাঁহাদের দ্বারা লুণ্ঠিত হইল। দেবগিরি ও দ্বারসমুদ্রের রাজারা আলাউদ্দীনের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

আলাউদ্দীনের উন্নতির এই চরমসীমা। তাহার পর তাঁহার অত্যাচারে অনেকেই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি মালিক কাফুরকেই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে ওমরাহগণ নানারূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিত। যে সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে আলাউদ্দীন অপসারিত করিলেন। তাঁহার নিজের পুত্রগণের মধ্যে কেহই তখনও উপযুক্ত হইয়া উঠেন নাই। এমন সময় আলাউদ্দীনের পীড়া হইল। রাজ্যময় ঘোরতর বিশৃঙ্খলা চলিতে লাগিল। সহসা আলাউদ্দীন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। খিলজীবংশের গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইল।

মালিক কাফুর তখন স্বয়ং নাবালক রাজপুত্রের নামে রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তিনি অনেককে

হত্যা করিয়াছিলেন—সেই পাপে নিজেও নিহত হইলেন।

কিছুদিন পরে মুবারক সম্রাট্ হইলেন। দিল্লীর রাজসভায় সুরার স্রোত বহিতে লাগিল। নানারূপ কুৎসিত আমোদে নবীন সুলতান উন্মত্ত হইলেন। ধর্ম্মের প্রকাশ্য অবমাননা রাজধানীতে চলিতে লাগিল। চারিদিকে হিন্দুগণ আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারাও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে লাগিলেন। দিল্লীর সাম্রাজ্য যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময় একজন উপযুক্ত ব্যক্তি আবার শাসনদণ্ড পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তোগলক-বংশ

আলাউদ্দীন যখন তাঁহার রাজ্যে নানাবিধ নব নব বিধি প্রবর্ত্তনে ব্যস্ত, সেই সময়ে এক নির্ভীক বীরপুরুষ সীমান্ত প্রদেশে থাকিয়া মোগলদিগকে পরাভূত করিতেছিলেন। ভারতে তুর্কী-সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন গাজী তোগলক। মোগলেরা তাঁহার নিকট একবার নহে, দুইবার নহে—উনত্রিংশবার পরাজিত হইয়াছিলেন। এই মহাযোদ্ধা যখন দেখিলেন সাধের দিল্লী পাপী কদাচারিগণের কবলে পড়িয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইতেছে—তখন তিনি সীমান্ত প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে আসিলেন।

তাঁহার প্রতাপের কথা সকলেই জানিত। পেচক যেমন সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকারে লুকায়িত হয়, ক্ষুদ্র ষড়যন্ত্রকারী ও অত্যাচারীর দল তাঁহার ভয়ে তেমনি ভীত হইয়া পড়িল। গাজী তোগলক সম্ভ্রান্ত ওমরাহ ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে সমবেত করিয়া যুক্তি করিতে

লাগিলেন রাজবংশের মধ্যে সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার উপযুক্ততা কাহারও আছে কিনা ? কাহাকেও পাওয়া গেল না। তখন সমবেত জনমণ্ডলী একবাক্যে বলিল, "গাজী মালিক সাম্রাজ্যের এই অরাজকতা বিদূরিত করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি একজন মাত্র আছে। সে তুমি। তুমিও সম্রাট্ হইয়া ধনী ও দরিদ্রের যুগপৎ আশীর্ব্বাদভাজন হও।" গাজী তোগলকের পদতলে তাঁহারা জানু পাতিয়া বসিলেন। তোগলক সুলতানের পদে আরোহণ করিলেন। তিনি রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া নানারূপ সদ্‌গুণের পরিচয় দিতে লাগিলেন। বিশৃঙ্খল রাজ্যে আবার যেন যাদুবলে শান্তি স্থাপিত হইল। আলাউদ্দীন্ করভারে প্রজাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তোগলক প্রথমেই তাহাদের দুঃখ বিমোচন করিলেন। সাম্রাজ্যের যেখানে যেখানে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা সম্রাট্‌পুত্র জুনাখাঁ দমন করিলেন। দাক্ষিণাত্য আবার দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিল। তোগলক নিজে বঙ্গদেশে আসিয়া এখানকার শাসনকর্ত্তাকে নত করিলেন।

তিনি যখন এই অভিযান হইতে দিল্লীতে ফিরিতে-

ছিলেন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য এক নবীন সৌধ নির্ম্মাণ করিলেন। সৌধের নির্ম্মাণ-কৌশল এমনি বিচিত্র যে সুলতান কিয়ৎকাল সেখানে থাকিতেই তাহা ভূমিসাৎ হইল। বীর গাজী তোগলক অপঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার দেহ খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেখা গেল এক হাত দিয়া তিনি তাঁহার একটী পুত্রকে জড়াইয়া ধরিয়া আছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি পুত্রকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সংসারের কি বিচিত্র গতি! এমন স্নেহপ্রবণ পিতা তাঁহারই এক পুত্রের হস্তে জীবন হারাইলেন!

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ তোগলক নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। এ পর্য্যন্ত দিল্লীতে যে তিনটী রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছে তাহার প্রত্যেকটীতেই একজন করিয়া প্রতিভাশালী ব্যক্তির অভ্যুদয় হইয়াছে। দাস-বংশে বুলবন্, খিলজী-বংশে আলাউদ্দীন আর তোগলক-বংশে মহম্মদ। এই তিন জনের মধ্যে আবার তোগলকের প্রতিভাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু প্রতিভা উন্মত্ততারই নামান্তর বলিয়া একজন কবি অভিহিত করিয়াছেন। সত্যই মহম্মদ তোগলক

প্রতিভাবান্ কি পাগল তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারে না।

মহম্মদ তোগলকের ন্যায় বিদ্বান্ ব্যক্তি সে যুগে মুসলমান-জগতে কেহই ছিল না বলিয়া প্রবাদ আছে। পারসিক কবিতার সুধারসে মহম্মদ মসগুল্ হইয়া থাকিতেন। তাঁহার লিখনভঙ্গী বড়ই সুন্দর ছিল। সেই অস্ত্র ঝনঝনার দিনেও তিনি বক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আবার অন্য দিকে তিনি দার্শনিক পণ্ডিত। ন্যায়শাস্ত্র ও গ্রীক দর্শন তিনি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তর্কে কোন পণ্ডিতই পারিয়া উঠিতেন না। অঙ্কশাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। বিজ্ঞানচর্চ্চায় তাঁহার উৎসাহ ছিল অসাধারণ। তাঁহার হস্তাক্ষর যথার্থই মুক্তার ন্যায় সুন্দর ছিল। তাঁহার সুন্দর মুদ্রা আজও লোক-সমাজে তাঁহার শিল্পজ্ঞান ও চারুরুচির পরিচয় প্রদান করিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে সে সময়ে যতটা বিদ্যা আয়ত্ত করা সম্ভব, তাহা তিনি করিয়াছিলেন।

এইরূপ বিদ্যাবত্তার সহিত আবার তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভার যোগ হইয়াছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি যেমন

প্রবল ছিল, ইচ্ছাশক্তিও তেমনি দুর্দ্দমনীয় ছিল। তিনি নূতন নূতন উপায় অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের সুখ-শান্তি বৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু লোকে যে নূতনত্বের পক্ষপাতী মোটেই নহে—সে ধারণা তাঁহার মনে মোটেই আসে নাই। তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝিয়াছেন লোকেও তাহাই ভাল বলিবে ইহাই তিনি আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ হইল তাহার বিপরীত। মহম্মদ তোগলক যেমন তাঁহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, তেমনি লোকে তাহা গ্রহণ করিতে চাহিল না। ফলে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। তাঁহার প্রজারা বিদ্রোহী হইল—তিনি তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করিলেন। তিনি যাহাদের মঙ্গল চাহেন—তাহারা তাঁহার কার্য্যের গুণ বুঝিল না ইহাতেই তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইত। দুঃখ হইতে ক্রোধ আসিত। সেই ক্রোধের ফলে সত্যই সাজান বাগান শুকাইয়া গেল। বিশাল মুসলমান সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

মহম্মদ তোগলকের ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। অধিকাংশ সময়েই তিনি ধর্ম্মালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি দরিদ্রদিগকে মুক্তহস্তে দান করি-

ত্তেন। এইজন্য রাজদ্বারে অসংখ্য ভিক্ষুক প্রত্যহ সমবেত হইত। মহম্মদের রাজসভায় এক সহস্র কবি, দ্বাদশ শত গায়ক ও এক সহস্র সুবিখ্যাত চিকিৎসক বাস করিতেন। আমাদের বিক্রমাদিত্যও বুঝি এতটা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন না।

তাঁহার রাজত্বকালে ইবন্ বতুতা আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি যে বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে আমরা তৎকালিক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি।

মহম্মদ তোগলক কখনও কাহারও মতামত গ্রহণ করিতেন না। নিজের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন। একবার তিনি ঐতিহাসিক বরণীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "দেখ! আমার রাজ্যের যেন কি রোগ হ'য়েছ। কোন চিকিৎসাতেই সার্‌ছে না। মাথার ব্যথা সারে তো জ্বর আসে। আবার জ্বর সারে তো অন্য রোগ এসে উপস্থিত হয়। এমন কি ওষুধ আছে বলো তো ঐতিহাসিক! যাতে ক'রে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজারা তাঁদের রাজ্যের শৃঙ্খলা রাখ্‌তেন।" বরণী বলিলেন, "এরূপ ক্ষেত্রে তাঁরা রাজপদ ত্যাগ করিতেন।" মহম্মদ তোগলকেরও একবার মনে হইল রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া তিনি

সকল জ্বালার শান্তি করেন। কিন্তু সে সংকল্প শুধু মনেই রহিয়া গেল—কাজে পরিণত হইল না।

মহম্মদ তোগলক বড়ই নিষ্ঠুরভাবে প্রজাদিগকে নির্য্যাতন করিতেন। শিক্ষিত হস্তীদের দন্তের সহিত শাণিত তরবারি বাঁধিয়া দেওয়া হইত—তাহাই দিয়া তাহারা হতভাগ্য বন্দীদিগের জীবনলীলার অবসান করিয়া দিত। মহম্মদের ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তি যে এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য কিরূপে করিতেন তাহা ভাবিয়া উঠাই কঠিন।

মহম্মদ দান করিতে বড় ভালবাসিতেন সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু কেবল গরীব দুঃখীকে দান করিয়াই তিনি তৃপ্ত হইতেন না। আমীর ওমরাহ-দিগকেও তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য্য উপঢৌকন দিতেন। তাঁহার নিজের প্রকাণ্ড শিল্পাগার ছিল। তাহাতে চারি সহস্র শিল্পী নানাবিধ পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করিত। কিন্তু সুলতানের মন ইহাতেও সন্তুষ্ট হইত না। তিনি চীন, ইরাক, আলেকজেন্দ্রিয়া প্রভৃতি সুদূর দেশ হইতে বহু-মূল্য বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া আনাইতেন। সেই সকল পোষাক তাঁহার প্রিয়পাত্রদিগকে বিতরণ করিতেন। পাঁচশত কারিকর দিল্লীতে তাঁহার জন্য সাঁচ্চাজরির পোষাক নির্ম্মাণ করিত। সেগুলিও বিতরিত হইত।

আরবের দশহাজার ঘোটকও প্রতিবৎসর তিনি বিতরণ করিতেন। ভোজনের সময় তিনি প্রায় কুড়ি হাজার লোক সঙ্গে লইয়া খাইতে বসিতেন। সে সময়ে অন্ততঃ দুইশত জন পণ্ডিত উপস্থিত থাকিত। তাঁহাদের সহিত বিবিধ শাস্ত্রালাপ করিতে করিতে সুলতান আহার করিতেন।

এরূপ ব্যয়ে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যও ফুরাইয়া যায়। সুলতানের ভাণ্ডার শীঘ্রই শূন্য হইয়া গেল। তখন তিনি অর্থ আহরণের জন্য নানারূপ অদ্ভুত কল্পনা করিতে লাগিলেন। তিনি চীন ও পারস্য জয় করিবার সংকল্প করিলেন। এইজন্য সহস্র সহস্র লোককে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে চীন ও পারস্য লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া একদিকে অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবেন—অপর দিকে বিরাট ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইবেন। কিন্তু এ কল্পনা যে কতদূর অসার তাহা তিনি একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না। লাভের মধ্যে তাঁহার অর্দ্ধেক সৈন্য অর্দ্ধপথেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আর অর্থ যে কত অপব্যয়িত হইল তাহার তো ইয়ত্তাই নাই।

তখন অর্থসংগ্রহের অন্য চেষ্টা আরম্ভ হইল। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা ভূমি।

তাহার উপর সুলতান অধিকতর কর নির্দ্ধারণ করিলেন। ইহাতে প্রজার একেবারে সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। অর্থের যথোচিত সমাগম হইতেছে না দেখিয়া মহম্মদের আর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তিনি পশুর ন্যায় হিন্দু প্রজাদিগকে শীকার করিয়া হত্যা করিবার জন্য বাহির হইলেন। কত সুজলা সুফলা দেশ তাঁহার অত্যাচারে মরুভূমি হইয়া গেল। গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। হতাশ প্রজারা তাহাদের বহুকালের বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু হায়! হতভাগ্যেরা যাইবে কোথায়?

এদিকে সুলতান স্থির করিলেন যে দিল্লী ভারতের এককোণে—অতএব এখানে রাজধানী হইতে পারে না। এমন একটী রাজধানী স্থাপন করিতে হইবে যে সেটী ঠিক ভারতবর্ষের মধ্যস্থানে হয়। দৌলতাবাদ এইরূপ স্থান বলিয়া তাঁহার মনে হইল। অতএব দিল্লীর সকল অধিবাসীর উপর হুকুম জারী হইল যে দৌলতাবাদে তাহাদিগকে বাস উঠাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। বহু দিনের বাসভূমি ছাড়িয়া যাওয়া যে কি কষ্টকর, তাহা কেবল সেই দুর্ভাগা প্রজারাই বুঝিতে পারিল। না যাইয়া কাহারও রক্ষা নাই। যাহারা গৃহকোণে লুকাইয়া

থাকিল সুলতানের ক্রীতদাসেরা তাহাদিগকেও খুঁজিয়া বাহির করিল। একজন অন্ধ আর একজন খোঁড়া না যাইতে পারিয়া দিল্লীতেই ছিল। সুলতান ইহা শুনিয়া ভয়ানক চটিয়া গেলেন। তাঁহার আদেশে খঞ্জকে তৎক্ষণাৎ গুলি করিয়া মারা হইল। আর অন্ধকে চল্লিশ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া দৌলতাবাদে যাইতে আদেশ দেওয়া হইল। ভ্রমণকালে লোকজনের চাপে বেচারার হাত পা ভাঙ্গিয়া গেল। অবশেষে সে প্রাণ-ত্যাগ করিল। কিন্তু সুলতানের আদেশ অতএব তাহাকে দৌলতাবাদে লইয়া যাইতেই হইবে। অবশেষে নবরাজধানীতে অন্ধের একখানি পা যাইয়া পৌঁছিল। এইরূপে তো দৌলতাবাদে প্রজা লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই আবার সুলতানের খেয়াল হইল যে দিল্লীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। দিল্লী তখন শ্মশান। তাই অন্যান্য প্রদেশ হইতে প্রজা আনিয়া কোনরূপে দিল্লীকে আবার রাজধানী করা হইল।

এই সময়ে প্রজাদের আর কষ্টের সীমা পরিসীমা রহিল না। মহম্মদ তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য সকল প্রকার অতিরিক্ত করগ্রহণ করা বন্ধ করিয়া
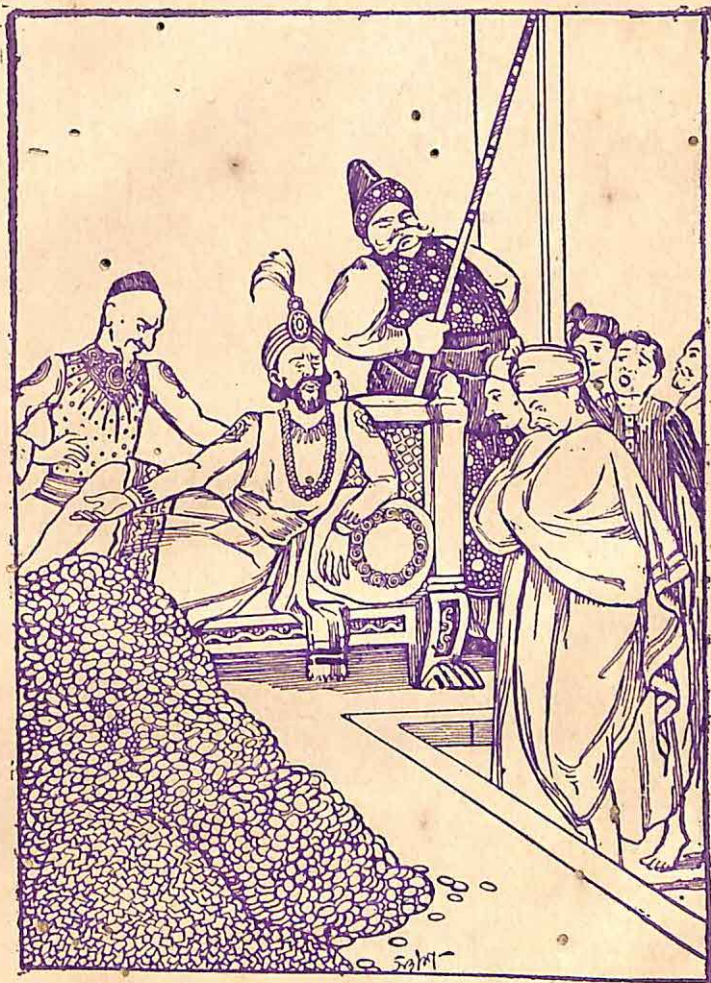
আর তামার টাকাকে রূপার তঙ্কার মুল্যে সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে এই ঘোষণা করিলেন। পৃঃ ১০১—তুর্কীভারত।
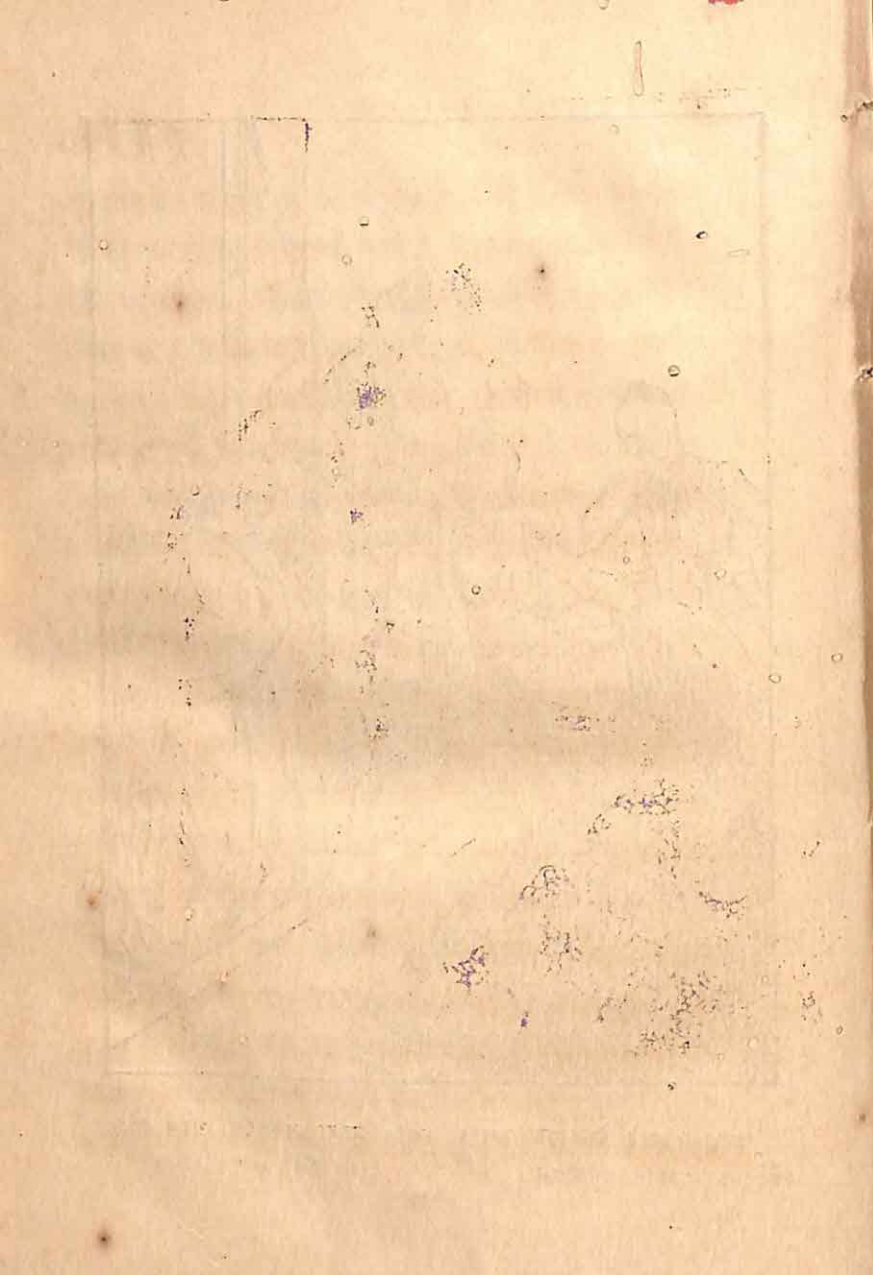
দিলেন। ছয়মাস ধরিয়া দিল্লীর লোকদিগকে তিনি বিনামূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তিনি আর এক নূতন প্রথা বাহির করিয়া তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিলেন। দেশে রূপার অভাব পড়িয়াছিল তাই তিনি চামড়ার মুদ্রার ব্যবহার প্রচলন করিলেন। আর তামার টাকাকে রূপার তঙ্কার মূল্যে সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে এই ঘোষণা করিলেন। ইহাতে মহম্মদের মনে কোন প্রতারণা করিবার দুরভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় লোকে ইহাতে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল। জুয়াচোরেরা নানারূপ জুয়াচুরি করিতে লাগিল। ঐতিহাসিকপ্রবর টমাস সাহেব সুলতানের এই নব উদ্ভাবনাকে অনেক প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে সত্যই তিনি একজন বড় অর্থনৈতিক ছিলেন। যাহা হউক মহম্মদ তোগলকের জীবনের অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় ইহাও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল।

মহম্মদ তোগলক দেশের মধ্যে অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বংশ তুর্কীও নহে, খিলজীও নহে—এক নূতন সঙ্কার-বংশ। সুতরাং লোকে তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালনে অভ্যস্ত ছিল না। তৎকালে আবার

যে সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিল—তাহারা কেহ বা আফগান, কেহ পারসিক, কেহ খুরাসানী, কেহ মোগল। তাহাদেরও সুলতানের প্রতি কোন নিঃস্বার্থ স্নেহভাব ছিল না। সুতরাং তাহারা বিদ্রোহ উপস্থিত করিল।

প্রথমে মহম্মদের প্রভাব আলাউদ্দীনের অপেক্ষাও বেশী ছিল। আলাউদ্দীন কেবলমাত্র দিল্লী ও দেবগিরি হইতে মুদ্রা প্রচার করিতেন। আর মহম্মদ তোগলকের টাঁকশাল দিল্লী, আগরা, ত্রিহুত, দৌলতাবাদ, বরঙ্গল, লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁ, সোণারগাঁ প্রভৃতি স্থানে ছিল। তাঁহার সাম্রাজ্য ২৩টী সুবিস্তৃত প্রদেশে বিভক্ত ছিল। কিন্তু মহম্মদের রাজত্বের শেষ কয় বৎসরের মধ্যে একে একে প্রদেশগুলি বিদ্রোহ আরম্ভ করিল। বহুস্থলে একই সময়ে বিদ্রোহ হওয়ায়, তিনি কোন দেশই রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার জীবনকালেই বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্য স্বাধীনতা অবলম্বন করিল। গুজরাত ও সিন্ধুপ্রদেশে যখন মহম্মদ তোগলক বিপ্লব বিনাশ করিতে যাইতেছিলেন, তখন তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন (১৩৫১ খৃষ্টাব্দ মার্চ্চ)। এত বড় প্রতিভাও ভারতের শান্তিবিধান করিতে পরিল না!

মহাঝটিকার পর যেমন সমুদ্র একপ্রকার বিষাদময়

শান্তভাব ধারণ করে, মহম্মদের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষ তেমনিভাবে ক্রমে ক্রমে শান্ত হইত লাগিল। মহম্মদের কোন পুত্রসন্তান ছিল না—সেইজন্য তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ফিরোজশাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

ফিরোজের মাতা ছিলেন রাজপুত-মহিলা। গিয়াস্ উদ্দীনের সৈন্যদল তাঁহার পিতৃরাজ্য আক্রমণ করিয়া যখন নানারূপ অত্যাচার করিতেছিল তখন এই মহিলা শুনিলেন যে তিনি যদি গিয়াস্উদ্দীনকে বিবাহ করেন, তবে তাঁহার পিতার রাজ্য ও প্রজাদল রক্ষা পায়। রাজকুমারী পরহিতার্থে এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এই বিবাহের ফলেই ফিরোজের জন্ম। ফিরোজ যখন রাজাসনে অধিরোহণ করিলেন, তখন তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর। সেসময়ে যে আবার নূতন করিয়া রাজ্য জয় করিয়া দিল্লীর গৌরব পুনরায় ফিরাইয়া আনেন, সে উদ্যম আর তাঁহার নাই। কিন্তু ফিরোজের মন দয়া দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি দিল্লী-সাম্রাজ্যের যে অংশ অবশিষ্ট ছিল, তাহাই লইয়া সুশাসন করিতে লাগিলেন।

বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্য তাঁহার রাজসভায় দূত প্রেরণ করিল, তিনিও তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

এইরূপে ফিরোজ ঐ দুইটী প্রদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। সিন্ধুদেশ নামমাত্র ফিরোজের অধীন রহিল। ফিরোজ যুদ্ধ-বিগ্রহে নররক্তের স্রোত বহাইতে ভাল বাসিতেন না। যে কয়টী যুদ্ধ নিতান্ত না করিলে নয়, কেবল তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী মকবুলখাঁ অতিসুদক্ষ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কৃতীত্বের ফলেই রাজ্যমধ্যে অত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া শান্তি বিরাজমান ছিল।

ফিরোজের রাজ্যকালে প্রজার গৃহ আবার ধনধান্যে পূর্ণ হইল। তাহাদের ম্লানবদনে আবার হাসির ছটা দেখা দিল। ফিরোজ তাঁহার সাম্রাজ্যের নানাবিভাগে বহু সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়া সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি কয়েটী সুন্দর সুন্দর নগরও স্থাপন করিয়াছিলেন। যমুনার খাল কাটিয়া তিনি কৃষিকর্ম্মের যে কিরূপ উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ফেরিস্তা বলেন, ফিরোজ শাহ ৮৪৫টী সাধারণের উপকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত খালগুলি সুনিপুণ পূর্ত্তবিদ্‌গণ সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি বন জঙ্গল কাটিয়া শস্যক্ষেত্র করিয়াছিলেন। ঐ সকল জমীর

আয় হইতে ধর্ম্ম ও বিদ্যার উৎসাহ দেওয়া হইত। তিনি অনেকগুলি বাগানও তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তাহার ফুল বিক্রয় করিয়াও বেশ লাভ হইত। এইরূপ নানা দিক্ দিয়া ফিরোজ তাঁহার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যটীর আয় বাড়াইতে লাগিলেন। প্রজারা ফিরোজকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিত। তিনিও প্রজারা কিসে সুখী হয়, তাহাই অনুক্ষণ চিন্তা করিতেন। তিনি দেওয়ান-ই-খয়রাত নামে একটি বিভাগের সৃষ্টি করিয়া দুঃস্থ প্রজাদের কন্যার বিবাহকালে অর্থ সাহায্য করিতেন। আজকাল আমাদের দেশে ফের ঐ রকম আর একটী বিভাগ যদি গবর্ণমেণ্ট খুলিতেন! কিন্তু ফিরোজ মূর্ত্তি-পূজার বড়ই বিরোধী ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে অনেক সময় হিন্দু-প্রজাদিগকে নির্য্যাতন করিতে হইত।

ফিরোজ ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে ৮৭ বৎসর বয়সে রাজকার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়েন। তাহার পর যে তিন বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন সে সময় নানা প্রকার বিদ্রোহ চারিদিকে দেখা দিল। ফিরোজের মৃত্যুর পর বিদ্রোহের আগুন চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিল। ফিরোজ শাসন-কার্য্যের জন্য কতকগুলি ক্রীতদাসের উপর নির্ভর করিতেন। এখন তাহারাই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ফিরোজের

বংশধরেরা কেহই এমন উপযুক্ত ছিলেন না যে আবার রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপন করিতে পারেন। রাজার পর রাজা দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে লাগিলেন। এদিকে আবার প্রদেশগুলি একে একে স্বাধীন হইতে লাগিল। দিল্লীর সাম্রাজ্য যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময় ধূমকেতুর ন্যায় এক বিজয়ী বীর আসিয়া সেই পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যের উপর কঠোর কুঠারাঘাত করিলেন। এই বীরের নাম তৈমুরলঙ্গ।

সপ্তম অধ্যায়

দিল্লী-সাম্রাজ্যের পতন

তৈমুরলঙ্গ ভারতের এক মহাদুর্দ্দিনে এদেশে আসিলেন। তাঁহার সহিত বিরানব্বই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য আসিল। তাহাদের অশ্বের খুরধূলিতে দিগন্ত অন্ধকার হইয়া গেল। বিজয়ী বীর তৈমুর পারস্য হইতে আফগানিস্থান ইহার পূর্ব্বেই বিধ্বস্ত করিয়াছেন। এইবার ভারতভূমির পালা। তৈমুরের পূর্ব্বপুরুষ চেঙ্গিস্‌খাঁ যেমন করিয়া লুণ্ঠন করিয়াছিলেন তৈমুর তাঁহার অপেক্ষাও নিষ্ঠুরভাবে ভারতবর্ষ বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

তখন তোগলকবংশীয় মামুদসা দিল্লীতে রাজ্য করিতেছিলেন। তিনি তৈমুরের আগমন-সংবাদ পাইয়াই পলায়ন করিলেন। তৈমুর দিল্লীর প্রবেশ-পথে কোনই বাধা পাইলেন না। রাজধানীর মধ্যে আসিয়া তিনি প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইলেন। তাহাদের ঘর জ্বালাইয়া দিলেন। অসংখ্য নরনারীকে

বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। দিল্লীর সুন্দর সুন্দর সৌধগুলি মোগল-সৈন্যেরা ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। মৃত দেহ-রাশিতে রাজপথ ঢাকিয়া গেল। দুর্গন্ধে বাতাস বিষাক্ত হইয়া উঠিল। কাহারও পক্ষে আর নগরে বাস করিবার উপায় রহিল না। সাধের দিল্লী এবার একেবারে জনহীন শ্মশান হইয়া গেল। তৈমুরের সৈন্যদল পাঁচ দিন ধরিয়া এখানে অগ্নি উৎসব করিয়াছিল। তাহার ফলে চারিদিক্ ভস্মে পরিণত হইল।

১৫ দিন দিল্লীতে থাকিয়া তৈমুর মীরাটে যাত্রা করিলেন। সেখানেও ঐরূপ অত্যাচার করিলেন। তাহার পর ভারতবর্ষের বহু প্রসিদ্ধ নগর ধ্বংস করিতে করিতে তৈমুর উত্তর সীমায় উপনীত হইলেন। সেখানে দরবার করিয়া উপযুক্ত রাজকর্ম্মচারীদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়া তৈমুর স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। যে মোগলেরা ভারতের এমন দুর্দ্দশা করিয়া গেলেন তাঁহারাই আবার দেড়শত বৎসরের মধ্যে এদেশের সম্রাট্ হইয়া কত উন্নতি সাধন করিবেন।

তৈমুর যখন এদেশ হইতে চলিয়া গেলেন, তখন মাহ্মূদ দিল্লীতে ফিরিলেন। কিন্তু সুলতানের পদ লইলেন আর একজন। দেশে ঘোরতর অরাজকতা

চলিতে লাগিল। এমন সময় ওমরাহগণ সমবেত হইয়া লোদী-বংশীয় দৌলতলোদী নামে এক ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা খিজিরখাঁ আসিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন।

খিজির সৈয়দ-বংশীয়। ইঁহারা মুসলমান-ধর্ম্মের স্থাপয়িতা মহম্মদের বংশধর। খিজিরের পর যথাক্রমে মুবারক, মহম্মদ ও আলাউদ্দীন রাজত্ব করেন। সৈয়দ-বংশ যে এত বৎসর কাল দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন—সে সময়ে সাম্রাজ্য বলিয়া আর কিছুই ছিল না। দেশ তখন খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

সৈয়দ-বংশের পতনের পর লোদীগণের অভ্যুদয় হইল। লোদীরা যথার্থই পাঠান। বহ্‌লোললোদী সম্রাট্ হইয়া দেশের অরাজকতা অনেকটা নিবারণ করিলেন। দিল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। জৌনপুর রাজ্য তিনি ছাব্বিশ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। তাহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে দিল্লীর সাম্রাজ্য আবার হিমালয় হইতে যমুনা পর্য্যন্ত এবং বারাণসী হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল।

বহ্‌লোলের পুত্র সেকন্দরশাহও চব্বিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তিনি বিহার প্রদেশ পুনরায় দিল্লীর অধীন করিলেন। বুন্দেলখণ্ডের দিকেও সাম্রাজ্য প্রসারিত হইল। কিন্তু সেকন্দরশাহ হিন্দুগণের উপর বড়ই অত্যাচার করিতেন। তিনি যেখানে যাইতেন সেই-খানেই হিন্দুর দেবদেবীর মন্দির ধ্বংস করিতেন। একবার এক ব্রাহ্মণ বলেন যে সকল ধর্ম্মই সমান। এই কথা শুনিয়া সুলতান ব্রাহ্মণকে বারজন মৌলবীর সহিত তর্ক করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। ব্রাহ্মণ কিছুতেই তাঁহার মত পরিত্যাগ করিলেন না। তখন সেকেন্দর তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

সেকেন্দরের পুত্র ইব্রাহিম ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান হইলেন। কিন্তু তিনি অক্ষম অথচ অহঙ্কারী ছিলেন। তিনি কাহাকেও যথোপযুক্ত সম্মান করিতেন না। এইজন্য অনেকেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহী হয়েন। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা মোগলনেতা বাবরকে আহ্বান করিলেন। ভারতবর্ষের প্রতি মোগলদিগের কিরূপ লোলুপ দৃষ্টি ছিল, তাহা পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছি। এইবার মোগল আসিয়া ভারতের সিংহা-সনে অধিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইল। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে

পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিমখাঁকে বাবর নিহত করিয়া ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। বাবর ও তাঁহার বংশীয়গণের বিবরণ তোমরা "মোগল ভারত" নামক গ্রন্থে পাঠ করিবে।

ভারতে তুর্কী ও পাঠান সাম্রাজ্যের কিজন্য পতন হইল, তাহা জানিতে তোমাদের ঔৎসুক্য হইতে পারে। সঙ্ক্ষেপে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি। যে দেশে সকল ক্ষমতা মাত্র একজন লোকের উপর ন্যস্ত থাকে, তখন সেই ব্যক্তির চরিত্রের উপরই দেশের সুখশান্তি সমস্ত নির্ভর করে। সেই ব্যক্তি যদি সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা হইলেন—তাহা হইলে দেশের সুখশান্তি বিরাজ করিল। আর যদি তিনি দুর্ব্বলচরিত্রের হইলেন—তাহা হইলে যে যেখানে পারিল, সেই স্বাধীনতা অবলম্বন করিল। প্রবলেরা দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। সকল সময়ে একই বংশে যে উপযুক্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিবেন এরূপ আশা করা যায় না। যদি প্রজাদের নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে তাহারা রাজ্য পরিচালনে সুনিপুণ ব্যক্তিকে রাজপদ প্রদান করিতে পারে। কিন্তু তুর্কীদের মধ্যে নিয়ম ছিল রাজার ছেলেই রাজা হইবে। সুতরাং প্রায়ই দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে

দুর্ব্বল রাজার আবির্ভাব হইত। সেই সময়ে আবার গৃহবিবাদ উপস্থিত হইত। এইরূপে ফিরোজশাহের মৃত্যুর পর নানারূপ গৃহবিবাদে তুর্কীদের ক্ষমতা একেবারে হীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাই বাবরের পক্ষে অত সহজে ভারতবর্ষ অধিকার করা সম্ভব হইল।

মহম্মদতোগলক তাঁহার খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য যে সকল অভিনব প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাহাও তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। সেই সময় হইতেই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা বিদ্রোহী হইতে আরম্ভ করেন। পরবর্ত্তী কয়েকজন সুলতানের রাজ্য-কালে এই বিদ্রোহের ভাব আরও বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

বঙ্গদেশ, জৌনপুর, মালব, গুজরাট প্রভৃতি উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান রাজ্যগুলি একে একে স্বাধীন হইতে লাগিল, ঐ সকল রাজ্য দিল্লীর সহিত সমস্ত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ উন্নতিলাভই করিয়াছিল। জৌনপুরের সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। আজও সেখানকার অসংখ্য সৌধমালা দর্শকের নয়নমনের তৃপ্তি সাধন করিতেছে।

দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর হিন্দুরাজ্য ছিল, তাহার অধিপতিগণ বিপুল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিতেন। বিজয়-নগর এযুগের হিন্দু-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের উত্তরে ও নর্ম্মদার দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের অবশিষ্ট ভাগ হোসেন গাঙ্গু নামে এক প্রতিভাবান্ মুসলমান অধিকার করিয়া লয়েন। হোসেন জাতিতে পাঠান ছিলেন। প্রথমে তিনি দিল্লীতে এক ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন। স্বীয় প্রতিভাবলে সেই নীচ অবস্থা হইতে উন্নতি করিয়া তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণ প্রভুর সম্মান রক্ষার্থ তিনি নিজের রাজ্যের নাম বাহ্মণী রাজ্য রাখেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

বাহ্মণী রাজ্যের সহিত বিজয়নগরের প্রায়ই বিবাদ হইত। হিন্দু মুসলমান দুই পৃথক্ জাতি বলিয়া বিবাদ বাধিত না। দুইটী সমৃদ্ধিশালী প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে যেমন বিবাদ হইয়া থাকে, তেমনি হইত। অনেক সময়ে হিন্দুসৈন্য যাইয়া মুসলমানের পক্ষে যোগ দিত—আবার অন্য সময়ে মুসলমান সেনানী বিজয়-নগরের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিত।

গুলবর্গ, বরঙ্গল ও বিদর্ভ ক্রমান্বয়ে বাহ্মণী রাজ্যের

রাজধানী হইয়াছিল। আজকাল যেখানে নিজামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, পূর্ব্বে সেই স্থানেই বাহ্মণী রাজ্য ছিল। বাহ্মণীদের সমৃদ্ধির সময়ে তাঁহারা দাক্ষিণাত্যের প্রায় অর্দ্ধাংশের উপর রাজত্ব করিতেন। তখন তাঁহাদের রাজ্যের দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা, উত্তরে উড়িষ্যা, পূর্ব্বে মশলি-পত্তন ও পশ্চিমে গোয়ানগরী ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগেই বাহ্মণীবংশের বিশেষ উন্নতি হইয়া-ছিল। পরে হিন্দু, মুসলমান, সিয়া, সুন্নি প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদের ফলে ইহার অধঃপতন ঘটে।

বাহ্মণী রাজ্যের ধ্বংসাবশেষে আবার পাঁচটী স্বাধীন মুসলমান রাজবংশের উদ্ভব হয়। যথা—আদিলশাহী-বংশ, কুতবশাহীবংশ, নিজামশাহীবংশ, ইমাদশাহীবংশ ও বরিদশাহীবংশ।

এইরূপে যখন ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি স্বাধীনতা অবলম্বন করিল, তখন আর দিল্লীর সাম্রাজ্য থাকিবে কি করিয়া?

তৈমুরলঙ্গ তাঁহার অমানুষিক অত্যাচারের দ্বারা ঐ সাম্রাজ্যের শেষ দশা উপস্থিত করেন। তিনি ইহার মূলে যে কুঠারাঘাত করিয়া গেলেন, তাহার ক্ষত আর

সারিল না। দিন দিন দিল্লীর সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে লাগিল।

তাহার পর যখন মোগলদিগকে ভারতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইল—তখনই এদেশের উপর তুর্কী ও পাঠানগণের প্রভুত্বের অবসান হইল।

অষ্টম অধ্যায়

তুর্কীদের অধীনে ভারতের অবস্থা

লোকে কথায় বলে—যেমন দিনটি যায়, তেমনটি আর আসে না। অতীতকে সোণার রঙে রাঙ্গিয়ে দেখা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে কাল গত হইয়া গিয়াছে, তাহার দুঃখকষ্ট সব লোকে ভুলিয়া যায়। কেবল মনে জাগিয়া থাকে অতীতের সেই মধুর আনন্দ-স্মৃতিটুকু। তাই আমাদের দেশের সেকালের কথা বলিতে যাইয়া অনেকেরই মনে ক্ষোভ হয়, নয়নকোণে অশ্রু দেখা দেয়—আর তাঁহারা বলেন "হায়! কি দিনই ছিল—আর কি হইল"।

দেশের অতীত অবস্থাকে তাঁহারা যতটা ভাল মনে করেন, হয়তো ঠিক ততখানি ভাল তাহা ছিল না। সে যুগের মানুষকেও অনেক বাধা বিপত্তি সহ্য করিতে হইত—অনেক অত্যাচার নীরবে মাথা পাতিয়া লইতে হইত। কিন্তু সেই সময়েরই লোকেরা আমাদের জন্য যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আজ সত্যই

আমাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিতে ইচ্ছা করে—"হায় ! সে যে রাম রাজত্ব ছিল।" তখন সকল লোকেই দুই বেলা দু'মুঠা খাইতে পাইত। দেশের টাকা তখন বিদেশীর উদরপূরণের জন্য সমুদ্রপারে চলিয়া যাইত না। ভারতমাতার ছেলেরা সব—মায়ের দান মাথা পাতিয়া লইয়া ভাগাভাগি করিয়া খাইত।

তুর্কীরা আমাদের দেশেই সংসার পাতিয়াছিলেন। তাঁহারা চাকুরী বা ব্যবসায় করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা এ দেশেই ব্যয় করিতেন। হয়তো তাহার মধ্যে অনেকটাই ছিল অপব্যয়। কিন্তু সে অপব্যয়ের ফলেও দেশের লোকেরই অন্ন জুটিত। এদেশ হইতে ধনরত্ন লইয়া যাইয়া অন্য কোন দেশে শেষ জীবন সুখবিলাসে যাপন করিবেন—এরূপ কোন ভাব তাঁহাদের মনে ছিল না। ভারতভূমিকেই তাঁহারা স্বদেশ করিয়া লইয়াছিলেন।

তাই এদেশের রাস্তাঘাট, পল্লী ও নগর যাহাতে সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে—যাহাতে তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হয় সে বিষয়ে তাঁহারা যথেষ্ট যত্নবান্ হইতেন। তুর্কীদের শাসন সময়ে যে সকল বিদেশীয় পর্য্যটক আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের লিখিত ভ্রমণ-কাহিনী

হইতে আমরা সে সময়ের নগরাদির অবস্থা জানিতে পারি। বহু লোক যেখানে ভাব ও অর্থের আদান প্রদান করিবার জন্য সমবেত হয়, সেই স্থানেই নগরলক্ষ্মী তাঁহার পদ্মাসন পাতেন। সুতরাং কোন দেশে যদি অনেক নগর থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সেখানকার লোকের অবস্থা বেশ ভাল।

১৪২০ খৃষ্টাব্দে নিকোলো ডি কন্টি নামক একজন ভিনিসদেশীয় পর্য্যটক আমাদের দেশে আসিয়া সমৃদ্ধ নগরগুলির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। গঙ্গার উভয় তীর নগরের মালায় যেন সুশোভিত ছিল। গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া কত শত তরণী বাণিজ্যসম্ভার বহন করিয়া লইয়া যাইত। তাই তাহার তীরে এত নগরের ঘটা। কন্টি গুজরাত হইতে মারমাগোয়াতে আসিবার কালে চারিটী অতি বিখ্যাত নগর দেখিতে পাইয়াছিলেন। আর মারমাগোয়াতে তিনি যে ঐশ্বর্য্য দেখিলেন—তাহা তাঁহার জন্মভূমি ইটালীতে নিতান্তই বিরল। মারমাগোয়ার স্বর্ণ, রৌপ্য ও হীরকের প্রভায় তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া গেল।

তুর্কী-শাসনের শেষ সময়ে বারবোসা ও বারটেমা নামে যে দুই জন ভ্রমণকারী এখানে আসিয়াছিলেন

তাঁহারাও ভারতবর্ষের নগরগুলি সম্বন্ধে ঠিক্ ঐরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বারবোসা স্বয়ং খম্ভাৎ (ক্যাম্বে) নগরীতে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি পৃথিবীর যাবতীয় জাতির বণিক্‌গণকে দেখিয়াছিলেন। খম্ভাৎ তখন বাণিজ্যের একটী প্রধান কেন্দ্র-স্থল। দিবা-রাত্র সে নগর ক্রয়-বিক্রয়ের শব্দে মুখরিত থাকিত। ইউরোপের ফ্ল্যাণ্ডার নগর যেমন শিল্পী ও কর্ম্মীগণের দ্বারা পরিপূরিত ছিল, খম্ভাৎ সেইরূপ চারু ও কারু-শিল্পীগণের আশ্রয়স্থল ছিল। পঞ্চদশ শতকের মধ্য-ভাগে আফ্রিকার পর্য্যটক ইবন্‌বতুতা এখানে আসিয়াছিলেন। তখন মহম্মদ তোগলকের খেয়ালে অনেকের অনেক সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। তথাপি ইবন্‌বতুতা ভারতবর্ষকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতভূমির সর্ব্বত্র তিনি নগর ও সহরে পূর্ণ দেখিয়াছেন।

ভারতবর্ষের যে অংশ হিন্দুগণের অধীনে ছিল, তাহারও সমৃদ্ধি কিছু কম ছিল না। তৈমুরলঙ্গের পৌত্রের নিকট হইতে ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে অবদাররজাক নামে একজন দূত দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের নগরমালার অশেষবিধ প্রশংসা

করিয়াছেন। হিন্দু-শাসিত বিজয়নগরের কথা বলিতে যাইয়া প্রত্যেক পর্য্যটকই যেরূপ উচ্ছ্বসিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাতে মনে হয় যে ইহা বুঝি ইন্দ্রের অমরাবতীর তুল্যই হইবে। বারটেমা তো অন্য কোন উপমা খুঁজিয়া না পাইয়া সে যুগের ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নগরী মিলানের সহিত ইহার তুলনা করিয়াছেন।

ইবন্‌বতুতা দক্ষিণ ভারতের শেষ সীমায় অবস্থিত মদুরা নগরকে অপর একটী দিল্লী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং সে সময়ে ভারতের উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল স্থানেই ঐশ্বর্য্যশালী নগর ছিল। ইবন্‌বতুতা মলবার প্রদেশে দুই মাস কাল অনবরত ভ্রমণ করেন; কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে এমন একটু জায়গা দেখিতে পাইলেন না যে সেখানে চাষ করা হয় নাই। সত্যই সে সময়ে দেশ সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ছিল।

দিল্লীর ঐশ্বর্য্যের কথা অনেকেই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। একুশটী স্বতন্ত্র নগর লইয়া এই মহানগরী গঠিত হইয়াছিল। সাহাবুদ্দীন নামক পর্য্যটক বলেন যে দিল্লীতে সকল গৃহই প্রস্তর ও ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেগুলির ছাদ

কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত হইত। গৃহগুলির অধিকাংশই দ্বিতল। তাহাতে নগরের মধ্যবিত্ত লোকেরা বাস করিত। আর ত্রিতল অট্টালিকাতে সুলতানের ওমরাহ বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ থাকিতেন। একতল গৃহও যে ছিল না, তাহা নহে। সেগুলিতে বোধ হয় দিল্লীর গরীব লোকেরা বসবাস করিত। দিল্লীর তিন দিকে সুবৃহৎ উদ্যান। তাহার পুষ্পশোভায় ও মধুর গন্ধে সমস্ত নগরবাসীর মন বিভোর হইয়া থাকিত। তুর্কী বাদশাহেরা জীবনকে কেমন করিয়া উপভোগ করিতে হয়, তাহা জানিতেন।

দিল্লীর অভ্যন্তরে বহু স্নানাগার স্থাপিত ছিল। সেখানে যে কেহ যাইয়া মহা আরামে স্নান করিতে পারিত। একটি তীর ছুড়িয়া যতদূর যায়, ততদূর অন্তর অন্তর এক একটি চৌবাচ্চা ছিল। সেখান হইতে নগর-বাসীরা বিশুদ্ধ পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইত।

দিল্লীর সুলতানেরা কেবল যে নগরবাসীর বিলাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা নহে; যাহাতে দুঃখীর দুঃখ নিবারণ হয়, রোগীর রোগ বিদূরিত হয়, সে ব্যবস্থাও তাঁহারা করিয়াছিলেন। নগরমধ্যে সত্তরটী সাধারণ দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত

ছিল। বিশাল কলিকাতা নগরীতে মাত্র গবর্ণমেণ্টের তিন চারিটী দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে। ইহা হইতেই সে যুগের সুলতানদের গুণ বুঝিতে পারিবে। শিক্ষার ব্যবস্থাও সেখানে নিতান্ত খারাপ ছিল না। এক দিল্লীর মধ্যেই এক সহস্র পাঠশালা ছিল।

ইবন্‌বতুতা বলেন যে দিল্লীর চারিদিক্ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাচীরটী ১১ হাত চওড়া। সুতরাং তাহার উপর দিয়া অনায়াসে গাড়ী ঘোড়াও চলিতে পারিত। প্রাচীরের গাত্রে প্রহরী ও দ্বার-রক্ষীদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। আর সেইখানেই নগররক্ষার জন্য বহু অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া দেওয়া হইত। দুর্ভিক্ষের সময় যাহাতে নগরবাসী আহার পায়, সে-জন্য প্রাচীরগাত্রে শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত। দীর্ঘকাল এক অবস্থায় থাকিলেও, শস্য নিতান্ত খারাপ হইয়া যাইত না। নব্বই বৎসর পূর্ব্বে বুল্‌বন্ যে শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা মহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এত দীর্ঘ দিনেও শস্য বিকৃত হইয়া যায় নাই। ঐ প্রাচীরের নিম্ন ভাগ প্রস্তর ও ঊর্দ্ধ ভাগ ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। তাহার উপরে অসংখ্য বুরুজ ঘন ভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল।

কতকগুলি নগর সমৃদ্ধ থাকিলেই যে দেশবাসী সুখে শান্তিতে থাকে একথা বলা চলে না। আজ আমেরিকার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। কতশত অট্টালিকা সেখানে অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছে। কত লোক সেখানে টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে। কিন্তু সেই আমেরিকাতেই আবার এমন অসংখ্য দরিদ্র আছে, যাহারা ছুটী পেটে খাইতে পায় না—মাথা রাখিবার একটু স্থান যাহাদের কোথাও নাই। তুর্কী ভারতে সেরকমটী ছিল না।

সেকালে সকলেই খাইয়া পরিয়া জীবনধারণ করিতে পারিত। তাহার কারণ দেশে যাহা ফসল জন্মিত, তাহা বিদেশে রপ্তানী হইয়া চলিয়া যাইত না। দেশের লোকেই তাহা খাইত। সুতরাং জিনিষের দামও ছিল তখন খুব কম। তোমরা অনেকেই গল্প শুনিয়াছ যে সায়েস্তাখাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হইত। সেকথা আজকাল তোমাদের পক্ষে বিশ্বাস করাও কঠিন—এমনই দেশের দুর্ভাগ্য। কিন্তু তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে তুর্কী ভারতে চাউলের দামও প্রায় ঐরূপ ছিল।

সাহাবুদ্দীন্ তখনকার প্রচলিত বাজার-দরের একটা

ফর্দ্দ দিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন যে এক মণ চাউল তিন আনা তিন গণ্ডাতেই পাওয়া যাইত। তাহা হইলে টাকায় পাঁচ মণ চাউল হইল। শুধু যে চাউলই সস্তা ছিল তাহা নহে। সকল জিনিষই ইহার তুলনায় সস্তা ছিল। গমের দর চাউলের দ্বিগুণ ছিল। বোধ হয় লোকে ভাত অপেক্ষা রুটীটা বেশী খাইত—তাই এমন দামের পার্থক্য। যব চারি আনা চারি গণ্ডায় এক মণ পাওয়া যাইত। আর ডাল ছিল সব চেয়ে সস্তা—দুই আনা দুই গণ্ডা মাত্র মণ। সাত আনা হইলে এক মণ মাংস পাওয়া যাইত। সুতরাং একটী ছোটখাট গৃহস্থের দুই টাকা হইলেই বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে একমাস চলিতে পারিত। আর দুইটী টাকা রোজগার করাও খুববেশী কঠিন ছিল না। তবে সেকালে টাকার মূল্য আজকালকার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। তাহা হইলেও সেকালের বেতনের কথা আলোচনার সময়ে আমরা দেখাইব যে টাকা উপার্জ্জন করা নিতান্ত কষ্টকর ব্যাপার ছিল না।

সেকালে এক আনা এক গণ্ডা দিলেই একটী মুরগী পাওয়া যাইত। আর দুই টাকা এক আনা বার গণ্ডা একটী ভেড়ার দাম, চারি টাকা দুই আনা এক গণ্ডা

একটী মহিষের দাম ও চারি টাকা দুই আনা চারি গণ্ডা একটী ষাঁড়ের দাম ছিল। সুতরাং গোটা দশেক টাকা খরচ করিয়া কয়েকটা পশু কিনিতে পারিলেও, তাহার আয় হইতেই সংসার চলিতে পারিত।

জিনিষ-পত্র এরূপ সস্তা ছিল বলিয়াই লোকে বিলাসের জন্য কিছু ব্যয় করিতে পারিত। যে ঐতিহাসিক ফিরোজশাহের রাজত্বের বিবরণ দিয়াছেন তিনি ভারতীয় প্রজাদের উন্নত অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। তাহাদের বাড়ীঘর-দুয়ার ভাল ছিল— আসবাবপত্র সুন্দর ও মজবুত ছিল। আর সকল প্রজার স্ত্রীই অলঙ্কার ধারণ করিত। তাহাদের মধ্যে যাহারা মধ্যবিত্ত তাঁহারা তাহাদের স্ত্রীকে স্বর্ণের অলঙ্কার দিত আর যাহাদের আয় অল্প ছিল তাহারা রূপার গহনা দিত। শয়নের জন্য প্রত্যেকরই একখানি করিয়া ভাল খাট থাকিত। আর সকলেরই ছোটখাট একখানি বাগান ছিল। ইবন্‌বাতুতাও বলিয়াছেন মলবার প্রদেশে সকলেরই বাড়ীতে এক একখানি বাগান ছিল ও সেই বাগান কাঠের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইত। ইংরাজ ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন প্রজাদের এতটা সুখ সমৃদ্ধি ছিল, তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়া-

ছেন যে ঐ বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে প্রজাদের অবস্থার প্রতি লেখকের খুব দৃষ্টি ছিল।

কিন্তু সে যুগে জিনিষপত্রের দাম সস্তা হওয়ার আরও অনেক কারণ ছিল—যাহাতে সকলেই দু' পয়সা রোজগার করিতে পারিত—দেশে বাণিজ্যের প্রসার ছিল। দেশী লোকের শিল্পকার্য্য দেশে বিদেশে বিক্রীত হইত। তুর্কী আমলের বন্দরগুলির প্রশংসা সকলেই করিয়াছেন। সেই সব বন্দরে আরব্য, পারস্য, চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে লোকে বাণিজ্য করিতে আসিত।

দেশের উপর দিয়া অনেক রাজনৈতিক বিপ্লব চলিয়া যাইত। কিন্তু তাহাতে সাধারণ লোকের বিশেষ কিছু আসিত যাইত না। যাহারা রাজধানীতে বা তাহার নিকটে বাস করিত তাহাদেরই সর্ব্বনাশ হইত। আর যাহারা দূরে গ্রামে থাকিত, তাহাদের উপর কোন অত্যাচার হইত না। কৃষকেরা কৃষিকর্ম্ম করিত—কর দিবার সময়, যিনি যখন রাজা হইতেন, তাঁহাকেই নির্ব্বিচারে রাজকর দিত। কিন্তু দেশের মধ্যে দস্যুভয় ছিল। তাই টাকা-পয়সা অত্যন্ত সাবধানে লুকাইয়া রাখিতে হইত। সাহাবুদ্দীন বলেন যে ভারতবাসীরা মাটীর নীচে ধনরত্ন পুঁতিয়া রাখিতেন।

সেকালে ক্রীতদাস-প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। যুদ্ধে যাহারা হারিয়া যাইত, তাহাদিগকে বিজেতারা ধরিয়া আনিয়া দাসত্বে নিযুক্ত করিতেন। অসংখ্য লোক এক এক যুদ্ধে এইরূপে তাহাদের স্বাধীনতা হারাইত। তবে ক্রীতদাসেরা প্রভুদের নিকট হইতে সাধারণতঃ ভাল ব্যবহার পাইত। সময় সময় হিন্দুরাও মুসলমান ক্রীতদাস রাখিতেন। ক্রীতদাসদের মূল্য নিতান্ত কম ছিল। মেয়েদিগকেও যুদ্ধের পর ধরিয়া ক্রীতদাসী করা হইত। আট তঙ্কা দাম দিলে একটী ক্রীতদাসী পাওয়া যাইত। তাহারা ঘরের সকল কাজকর্ম্ম দেখিত। অনেকে ক্রীতদাসীদিগকে উপপত্নীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। গৃহকার্য্যে নিপুণা এইরূপ রমণীর মূল্য ১৫ তঙ্কা ছিল।

সেকালের রাস্তাঘাট যাহাতে ভাল থাকে, তাহার প্রতি সুলতানগণ খুব মনোযোগ দিতেন। রাজপথ সুগম ছিল বলিয়াই অত প্রাচীনকালেও ডাকের সুব্যবস্থা হইয়াছিল। ডাক দুই প্রকার ছিল। প্রথম প্রকার ডাক অশ্বদ্বারা বাহিত হইত। প্রতি ৪ মাইল অন্তর অন্তর অশ্ব পরিবর্ত্তন করা হইত। এই প্রকার ডাক ইংলণ্ডে দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও ছিল। আর দ্বিতীয়

প্রকার ডাক মানুষের দ্বারা বাহিত হইত। কিন্তু ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রথা অপেক্ষাও দ্রুতগামী ছিল। সেইজন্য লোকে এই প্রকার ডাককেই বেশী পছন্দ করিত। ইহার নাম ছিল আড়িন্দা ডাক। এক ক্রোশের মধ্যে তিনটী আড্ডা থাকিত। প্রত্যেক আড্ডাতে লোকজন ঠিক্ হইয়া বসিয়া থাকিত। এক আড্ডা হইতে একজন লোক আসিতেছে শব্দ পাইলেই, অন্য আড্ডার লোক পথে আসিয়া দাঁড়াইত ও তাহার নিকট হইতে ডাক লইয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিত। যাহারা এরূপ দৌড়াইত তাহাদের হাতে একখানি করিয়া দুইহাত লম্বা লাঠি থাকিত। সেই লাঠির আগায় ঘণ্টা বাঁধা থাকিত। তাহারই শব্দ করিতে করিতে লোকটী ছুটিত। ইবন্-বাতুতার এই বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যে আজকালকার ডাকবাহকেরা সেই তুর্কীযুগের প্রথাই বজায় রাখিয়াছে।

তুর্কী ভারতে সুলতানের সম্মান সকলের উপরে ছিল। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন। কোরান শাস্ত্রে অবশ্য নিয়ম আছে যে তিনি মহম্মদীয় ধর্ম্মের সকল বিধি মানিয়া চলিতে বাধ্য। কিন্তু রাজ্য মধ্যে এমন কোন পরাক্রান্ত ব্যক্তি বা সম্প্রদায় ছিল না, যে বা যাহারা সুলতান অন্যায় করিলে তাহার

প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয়। সুলতানের ক্ষমতা যে কিরূপ অপ্রতিহত ছিল তাহা তোমরা মহম্মদ তোগলকের বিবরণ হইতেই বুঝিতে পারিয়াছ।

কিন্তু সুলতানেরা সাধারণতঃ অত্যাচারী হইতেন না। তাঁহারা রাজ্যরক্ষা ও প্রজা পালন করিতেন। যাহাতে সকলে তাঁহাদের নিকট যাইয়া দেখা করিতে পারে, সে ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছিলেন। রাজসভায় বসিয়া প্রত্যহ তাঁহারা বহু আবেদন নিবেদন শুনিতেন। অনেক মোকদ্দমা স্বয়ং নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। তিনি শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ থাকিতেন। যাঁহারা সত্য সত্যই ক্ষমতার ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা সর্ব্বদা কাজকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। আর যাঁহারা দুর্ব্বল প্রকৃতির সুলতান হইতেন, তাঁহারা বিলাসের পঙ্কে নিমগ্ন থাকিতেন। দেশের একজন লোকই যখন কর্ত্তা হয়, তখন সে ব্যক্তি ঐরূপ দুর্ব্বল চরিত্রের হইলে অনেক বিপদ উপস্থিত হয়।

সুলতান যদি বিলাসী ও রাজকার্য্যে অমনোযোগী হইতেন, তাহা হইলে শাসন-ক্ষমতা সাধারণতঃ উজীরের উপর পড়িত, উজীর সে যুগের প্রধান মন্ত্রী। রাজ্যের সকল কাজের উপরই তাঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইত।

তিনি যাহা আদেশ করিতেন, তাহা অমান্য করে এরূপ ক্ষমতা কাহারও ছিল না।

দূরস্থ প্রদেশগুলি শাসন করিবার জন্য এক একজন শাসনকর্ত্তা প্রেরণ করা হইত। তিনি সেখানকার একজন ছোটখাট স্থলতান হইয়া বসিতেন। সে দেশের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতাই হইতেন তিনি। কি বিচারকার্য্য, কি শাসনকার্য্য, কি সৈন্য-পরিচালনা— সকল কর্ম্মই তাঁহাকে দেখিতে হইত। তাঁহার অধীনে বহু কর্ম্মচারী থাকিত। তাহার মধ্যে দুই চারিজনকে স্থলতান স্বয়ং নির্ব্বাচন করিয়া প্রেরণ করিতেন; কিন্তু তাঁহারাও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে ছাড়াইয়া কোন কাজ করিতে পারিতেন না। আর বাকী সকলে শাসনকর্ত্তা দ্বারা নিযুক্ত হইতেন। যখন দিল্লীর স্থলতান দুর্ব্বল হইতেন তখন ইঁহারা বিদ্রোহী হইয়া নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন। এরূপ ব্যাপার সেখানে প্রায়ই ঘটিত।

অধিকাংশ প্রদেশেই হিন্দু রাজা ও জমীদার থাকিতেন। তাঁহারা দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়া কর প্রদান করিতেন। কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে তাঁহারা স্বাধীনই ছিলেন। স্থলতান যখন কোথাও

যুদ্ধ করিতে যাইতেন, তখন ইহারা তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইতেন। ইহারাও সময় ও সুযোগ বুঝিলে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতেন। ফল কথা সে যুগে যাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে থাকিতেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা মারামারি কাটাকাটি করিতে হইত।

তুর্কী সাম্রাজ্যে সাধারণতঃ পাঁচ শ্রেণীর প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ ছিলেন, তাঁহাদের উপাধি ছিল খাঁ। ইহারা বছরে দুই লক্ষ তঙ্কা বেতন পাইতেন। তখনকার এক তঙ্কা এখনকার চারি টাকা তের পয়সার সমান। সুতরাং সে কালের এক একজন খাঁ বড় লাটের চেয়েও বেশী মাহিনা পাইতেন। আর এই রকম অন্ততঃ আশীজন খাঁ সুলতানের অধীনে কাজ করিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজ-কর্ম্মচারীকে মালিক বলা হইত। তাঁহারা পঞ্চাশ হাজার হইতে যাট হাজার তঙ্কা বেতন পাইতেন। আমাদের মৌর্য্য রাজাদের আমলে প্রধান মন্ত্রীকে মাত্র আটচল্লিশ হাজার মুদ্রা বেতন দেওয়া হইত। আমরা অবশ্য সেই মুদ্রার আধুনিক মূল্য কত জানি না। তথাপি মনে হয় যে সুলতানেরা তাঁহাদের কর্ম্মচারি-

দিগকে খুব মোটা মাহিনা দিয়া রাখিতেন। বেশী মাহিনা দিলে কর্ম্মচারীরা আর চুরি করিবে না বা ঘুসের লোভে প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না ইহাই তুর্কী স্থলতানদের ধারণা ছিল। সাধারণ সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারিগণ আমীর নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা অনেক সময়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতেন। রাজা দুর্ব্বল হইলে রাজক্ষমতা তাঁহারাই পরিচালনা করিতেন। আমীরেরা ত্রিশ হাজার হইতে চল্লিশ হাজার তঙ্কা বেতন পাইতেন। যাঁহারা সেনাবিভাগে অধিনায়কের কর্ম্ম করিতেন তাঁহাদিগকে সিপাহসালার বলা হইত। তাঁহারা প্রত্যেকে কুড়ি হাজার তঙ্কা করিয়া বেতন পাইতেন। আর সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর জন্দ উপাধি-ধারী রাজপুরুষগণ এক হাজার হইতে আরম্ভ করিয়া গুণানুসারে দশ হাজার তঙ্কা পর্য্যন্ত বেতন পাইতেন।

আর এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা বেতন লইতেন না। তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ জমী পাইতেন। তাহার উপস্বত্ব তাঁহারা ভোগ করিতেন। কিন্তু কর্ম্ম-চারিদিগকে জমী বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া প্রথাটা তেমন স্থবিধাজনক নহে। যদি দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন তাহারা স্থলতানের উপর নির্ভর

করে না। আবার রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় তাহারা ইচ্ছামত নিজে নিজে স্বাধীনতা অবলম্বন করিবার সুযোগ পায়। এই সকল অসুবিধার কথা সুলতানেরা জানিতেন; সেইজন্য তাঁহারা সহসা কাহাকেও জমী দিতেন না।

সুলতানের নিজের একটী স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। তাহাতে উজীরই ছিলেন প্রধান। সুলতান যখন বিদেশে যুদ্ধ-যাত্রা করিতে বা মৃগয়া করিতে গমন করিতেন, তখন উজীর তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপে সকল কার্য্য চালাইতেন। যে সকল সুলতান বিলাস-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া, রাজকার্য্যে অবহেলা করিতেন, তাঁহারা উজীরের হাতের খেলার পুতুলের মতন হইতেন। উজীর যাহা বলিত, তাঁহাকে তাহাই করিতে হইত। উজীরের অধীনে আবার চারিজন সহকারী উজীর থাকিতেন। কার্য্যাদি পরিচালন করিবার জন্য চারিজন দবীর বা সেক্রেটারী থাকিতেন। তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে আবার তিনশত করিয়া কেরাণী কাজ করিত। এই কেরাণীদের বেতনও দশ হাজার তঙ্কার কম ছিল না। আজকাল যাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কেরাণীর কার্য্য করেন, তাঁহাদের

বেতন বড়জোর নয় হাজার টাকা হয়। সুতরাং বলিতে হইবে যে সে যুগের সুলতানের কর্ম্মচারীরা একালের অপেক্ষা অন্ততঃ চারিগুণ বেশী বেতন পাইতেন।

সুলতানের দাসদাসী যে অসংখ্য ছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। ইবন্‌বাতুতা বলেন যে মহম্মদতোগলক্‌ কেবল শিকারের সময় সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য এগার-শত লোক প্রতিপালন করিতেন। সামান্য একজন ক্রীতদাসের উপর অনেক খরচ হইত। সে মাসে দুই মণ গম বা চাউল পাইত। আর প্রত্যেক দিন তিনসের মাংস ও তাহা রন্ধন করিতে যে সকল মসলা প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, তাহাও পাইত। পরিধানের জন্য তাহারা বৎসরে চারি প্রস্থ বস্ত্রাদি পাইত। এই সকল ছাড়া আবার তাহারা প্রতিমাসে ৩০ তঙ্কা করিয়া বেতন পাইত। আজকাল একজন এম, এ পাশ যুবকের পক্ষেও ৩০ তঙ্কা অর্থাৎ ১২৫৲ টাকা উপার্জ্জন করা কঠিন। কিন্তু সুলতানেরা যে এত ব্যয় করিতেন, তথাপি দেশ গরীব হইয়া যাইত না। কেন না তুর্কীরা যে টাকা পাইত তাহা তাহারা এই দেশেই ব্যয় করিত। এখান হইতে উপার্জ্জন করিয়া অন্য দেশে লইয়া ব্যয়

করিত না। আর তাঁহারা হিন্দু কর্ম্মচারীও অনেক নিয়োগ করিতেন। ঐ সকল কর্ম্মচারী নানা রকম পর্ব্ব উপলক্ষে দেশের লোককে অনেক দান করিতেন। গ্রামবাসীদিগকে পরিতোষ সহকারে আহার করাইতেন। বাবর তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে তিনি যে সময় ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন, সে সময় মুসলমানদের অধীনে যে সকল কর্ম্মচারী কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। রাজস্ব-বিভাগ হিন্দুদের একচেটিয়া ছিল। তাঁহারা ব্যতীত আর কোন জাতি হিসাব-নিকাশের কাজ করিতে পারিত না। তুর্কী বা অন্যান্য মুসলমানদের মাথা হিসাবের অঙ্ক দেখিলেই ঘুরিয়া উঠিত।

এ সকল সত্ত্বেও হিন্দুদের উপর সময় সময় অত্যন্ত অত্যাচার করা হইত। অত্যাচারের মাত্রা সুলতানের প্রকৃতির উপর নির্ভর করিত। খিলজী-বংশের সুলতানেরা বিশেষ করিয়া হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। আলাউদ্দীন খিলজীর হিন্দু-নির্য্যাতন সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। একবার আলাউদ্দীন তাঁহার এক কাজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাজী সাহেব! হিন্দুদের নিকট হইতে কত, আর কি

প্রকার কর লওয়া শাস্ত্রের বিধান বলুন তো।” কাজী দেখিলেন তিনি যদি সত্য কথা বলেন, তবে তাঁহার উপর সুলতান চটিয়া যাইবেন। কেন না আলাউদ্দীন করটা একটু বেশী রকমই লইতেন। তাই বুদ্ধিমানের মতন তিনি উত্তর দিলেন—“হিন্দুদের সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে যে—রাজ-কর্ম্মচারী যদি রূপার টাকা চায় তবে, তাহার উচিত সোণার টাকা দেওয়া। আর রাজকর্ম্মচারী তাহার মুখে ধূলি ফেলিয়া দিলেও, তাহা নিবারণ করিবার জন্য মুখ বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। এইরূপ ব্যবহার যদি করা যায়, তবেই রাজকর্ম্মচারীদের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখান হয়। ঈশ্বর স্বয়ং হিন্দুদের ঘৃণা করেন। সুতরাং তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিলে কোনই দোষ হয় না।” এই কথা শুনিয়া আলাউদ্দীন কেবলমাত্র একটু হাসিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

সম্পূর্ণ।